ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর), বাংলাদেশ

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর), বাংলাদেশ

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের
মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

ঢাকা, ২০০৯

ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর), বাংলাদেশ

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৯

প্রকাশক
হিউম্যান রাইটস ফোরাম অন ইউপিআর, বাংলাদেশ-এর পক্ষে
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
৭/১৭, ব্লক বি, লালমাটিয়া, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোন: ৮৮-০২-৮১২৬১৩৭, ৮১২৬১৩৪
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১২৬০৪৫
ইমেইল: ask@citechco.net
ওয়েব: www.askbd.org

© আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত। এ প্রকাশনার কোনো অংশ লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে পুনমুদ্রণ করা যাবে না। তবে যে কেউ এর অংশবিশেষ গবেষণা বা লেখায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সাপেক্ষে উদ্ধৃত করতে পারবেন।

প্রচ্ছদ
মনন মোর্শেদ

ISBN: 978-984-33-1355-3

মূল্য: ১৫০ টাকা

মুদ্রক
অর্ক
১/৩, ৪র্থ তলা, ব্লক ই
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

Universal Periodic Review (UPR), Bangladesh, published by Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block B, Lalmatia, Dhaka. December 2009.

সূচি

কৃতজ্ঞতা ৪

প্রথম অধ্যায় ৫
ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর), বাংলাদেশ: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পেশকৃত রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন

তৃতীয় অধ্যায় ৪৭
ইউপিআর ফোরাম কর্তৃক প্রেরিত বিকল্প প্রতিবেদন

চতুর্থ অধ্যায় ৭৯
জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বেসরকারি প্রতিবেদনের সঙ্কলন

পঞ্চম অধ্যায় ৯৭
বাংলাদেশের কাছে প্রেরিত আগাম প্রশ্ন

ষষ্ঠ অধ্যায় ১০১
বাংলাদেশের প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গিকার

সপ্তম অধ্যায় ১১৭
চুড়ান্ত অধিবেশনে ইউপিআর ফোরামের পক্ষ থেকে পঠিত বিবৃতি

কৃতজ্ঞতা

ইইউপিআর বা সর্বজনীন পুনর্বীক্ষণ জাতিসংঘ মানবাধিকার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত একটি নতুন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জাতিসংঘের প্রতিটা সদস্য রাষ্ট্রের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি চার বছর অন্তর অন্তর পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদান করা হয়। এই প্রক্রিয়ার আওতায় ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। এই পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় বিকল্প প্রতিবেদন প্রদান এবং অন্যান্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালে আইন ও সালিশ কেন্দ্রকে (আসক) সচিবালয় করে ইউপিআর ফোরাম বাংলাদেশ নামে ১৭টি সংগঠনের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। সার্বিকভাবে ইউপিআর বিষয়টি সম্পর্কে এবং ইউপিআর ফোরামের কার্যক্রম সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করাই এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য। এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত মূল রিপোর্ট, বিবৃতি, পরিসংখ্যান সবই ছিল ইংরেজিতে। ইংরেজি ডকুমেন্টগুলো তৈরিতে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। বাংলা প্রকাশনার জন্য যারা অনুবাদে সহায়তা করেছেন তাদেরও ধন্যবাদ। বাংলা প্রকাশনাটির সম্পাদনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেছেন আসক-এর মিডিয়া অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভোকেসি ইউনিটের সিনিয়র সমন্বয়ক এবং ইউপিআর ফোরামের সমন্বয়ক সাঈদ আহমেদ। তাকে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন ইউপিআর ফোরামের সদস্যবৃন্দ এবং আসক-এর প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদক শাহীন আখতার। তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

বইটির অক্ষরবিন্যাস করেছেন আসক-এর কম্পিউটার বিভাগের কর্মী মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ও রিজওয়ানুল হক। অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ ডিজাইন করেছেন মনন মোর্শেদ। প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান-অর্ক। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

সুলতানা কামাল
নির্বাহী পরিচালক, আসক

প্রথম অধ্যায়

ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর), বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সাঈদ আহমেদ, সমন্বয়ক, ইউপিআর ফোরাম

ইউপিআর কী ও কেন?

সর্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতি (ইউপিআর) জাতিসংঘ মানবাধিকার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত একটি নতুন পদ্ধতি। এটি এমন এক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর জাতিসংঘের সদস্য প্রতিটা রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতি পুনর্বীক্ষণ করবে। সম্প্রতি বিলুপ্ত জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে, কমিশন তার কর্মকাণ্ডে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কোনো ইস্যুতে সোচ্চার, আবার কোনো ইস্যুতে নিশ্চুপ অথবা একই ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনায় কোনো দেশের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সরব আবার অন্য কোনো দেশের ক্ষেত্রে একেবারে চুপচাপ– এ ধরনের পক্ষপাতমূলক দ্বৈতনীতির কারণে মানবাধিকার কমিশন ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে এবং কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেই মূলত 'সর্বজনীন পুনর্বীক্ষণ' ধারণার সূচনা হয় এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনকে অধিকতর শক্তিশালী করে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল গঠন করা হয়।

হিউম্যান রাইটস ফোরাম অন ইউপিআর, বাংলাদেশ

ইউপিআর-এর ক্ষেত্রে তিনটি প্রতিবেদনকে বিবেচনায় নেয়া হয়। ১. সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন; ২. জাতিসংঘ ও এর সহযোগী সংস্থা প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন এবং ৩. বেসরকারি সংস্থাসহ অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন। শেষোক্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সঠিক চিত্র তুলে ধরা এবং সে পরিস্থিতি উন্নয়নে সম্ভাব্য ব্যবস্থার সুপারিশ দেয়ার ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বিবেচনায় আইন ও সালিশ কেন্দ্রকে (আসক) সচিবালয় করে ১৭টি সংগঠনের[১] সমন্বয়ে গঠিত হয় 'হিউম্যান রাইটস ফোরাম অন ইউপিআর, বাংলাদেশ'। এই কোয়ালিশনের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনে ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ একটি যৌথ প্রতিবেদন পাঠানো হয়, যা জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনে গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ফোরামের পক্ষ থেকে উপস্থিত থেকে মতামত দেয়া হয় এবং উদ্বেগের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করে লিখিত প্রতিবেদনও পাঠানো হয়। ফোরামের পক্ষ থেকে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল জেনেভাস্থ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত ইউপিআর অধিবেশনে যোগ দেন। তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

১. আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)- সচিবালয়, এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন (এএসএফ), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (বিএমপি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ দলিত অ্যান্ড এক্সক্লুডেড রাইটস মুভমেন্ট (বিডিইআরএম), সেন্টার ফর রিহাবিলিটেশন অব টর্চার সারভাইভারস (সিআরটিএস), ডি-নেট, কর্মজীবী নারী, নাগরিক উদ্যোগ, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, নিজেরা করি, নারীপক্ষ, ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশনস উইথ ডিজাবল (এনএফওডব্লিউডি), রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কালেকটিভ (আরডিসি), স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট (স্টেপস), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

বাংলাদেশের ইউপিআর অধিবেশন

৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ বাংলাদেশ ইউপিআর ওয়ার্কিং গ্রুপের অধিবেশনটি ছিল ৩ ঘণ্টার। অধিবেশনের শুরুতে রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি। দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত নানামুখী উদ্যোগ এবং তার সাফল্য, মানবাধিকারের সপক্ষে গৃহীত নানা পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থাপনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও মানবাধিকার, নারী অধিকার, সংখ্যালঘু অধিকার, বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট কোনো অঙ্গীকার ছিল না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর করার ব্যাপারে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও তার জন্য সুনির্দিষ্ট কী পদক্ষেপ নেয়া হবে, কবে নেয়া হবে তা স্পষ্ট করে বলেননি তিনি। সর্বোপরি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উত্থাপিত বক্তব্যে মানবাধিকারের আঙ্গিকে দেশের বিদ্যমান সমস্যা বিশ্লেষণের কোনো জোরালো প্রতিফলন পাওয়া যায়নি। শরণার্থী বিষয়ে রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা অস্বীকার এবং শরণার্থী বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশনে অনেক দুর্বলতা রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে শরণার্থী গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে। এ বক্তব্যে শরণার্থীদের বিষয়ে গৃহীত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এটি খুবই দুঃখজনক এই কারণে যে, ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে। তাছাড়া গত প্রায় চার দশকে রাজনৈতিক কারণে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকার কারণে অনেককেই শরণার্থী হিসেবে বিদেশে পাড়ি জমাতে হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর লিখিত বক্তব্যের পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদনের ওপর বক্তব্য রাখেন এবং কিছু সুপারিশও প্রদান করেন। ৭০টিরও বেশি দেশ কথা বলার জন্য নাম অন্তর্ভুক্ত করলেও বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে ৪৮টি দেশ বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ পায়। উল্লেখ্য, বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য প্রতিটি দেশ দুই মিনিট করে সময় বরাদ্দ পায়। এর মধ্যে অনেকগুলো দেশ ছিল যাদের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেই সংগঠিত করা হয়েছিল। তাদের বক্তব্য বাংলাদেশের প্রতিবেদনের ভূয়সী প্রশংসা এবং বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে ইউপিআর ফোরাম কর্তৃক উত্থাপিত ইস্যুগুলোকে আমলে নিয়ে কিছু দেশ বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশমালা প্রদান করে।

অধিবেশনের শেষাংশের প্রশ্নোত্তর পর্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রদত্ত সুপারিশমালা বিষয়ে বলেন– এগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। তিনি বলেন, নির্যাতনবিরোধী আন্তর্জাতিক চুক্তির ঐচ্ছিক প্রটোকল অনুমোদনের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। তবে শরণার্থী বিষয়ক কনভেনশন, অভিবাসী শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন, বলপূর্বক অন্তর্ধান বিষয়ক চুক্তি, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুমোদনের ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি। তাছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহারের ব্যাপারেও ছিল না স্পষ্ট কোনো অঙ্গীকার।

ইউপিআর ফোরামের সংবাদ সম্মেলন

সর্বজনিন পুনর্বীক্ষনে অংশ নেয়ার জন্য জেনেভা যাওয়ার পুর্বে ২৭ জনুয়ারি ২০০৯ সংবাদ সম্মেলন করে মিশন সম্পর্কে গণমাধ্যমকে অবহিত করা হয় এবং পুনর্বীক্ষণ থেকে ফিরে এসে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ইউপিআর ফোরামের পক্ষ থেকে আবারো সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সেখানে ফোরামের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত দাবি উত্থাপন করা হয়–

পুনর্বীক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত সুপারিশমালা আলোচনার জন্য সংসদে উত্থাপন করা;

সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা;

প্রদত্ত অঙ্গীকার পর্যালোচনার জন্য মানবাধিকার সংগঠন ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময় করা; এবং

মানবাধিকার বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করে নাগরিক সমাজের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়ন পর্যালোচনার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময়

বাংলাদেশের ইউপিআর সংক্রান্ত চূড়ান্ত অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় ১০ জুন ২০০৯। চূড়ান্ত অধিবেশনের আগে ফোরামের পক্ষ থেকে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের অধিবেশনে সরকারের তরফ থেকে দেয়া অঙ্গীকারগুলোর বিষয়ে জুন পর্যন্ত কী কী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তদুপরি বিরাজমান উদ্বেগগুলোর ওপর আলোকপাত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। সেটি জেনেভাস্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতাবাসে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কাছে পাঠানো হয়। ৭ জুলাই সেটি নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনির সঙ্গে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এর চুম্বক অংশ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে পাঠও করা হয়।

ফোরামের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম

চূড়ান্ত অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অধিকাংশ সুপারিশ গ্রহণ করে সেগুলো পূরণের অঙ্গীকার করা হয়। যদিও কত সময়ের মধ্যে, কী প্রক্রিয়ায় সেগুলো পূরণ করা হবে তা সেভাবে স্পষ্ট করা হয়নি। ইউপিআর ফোরাম এ বিষয়ে সর্বসাধারণকে অবহিত করা, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো পরীবিক্ষণ এবং মূল্যায়ন করার মাধ্যমে সরকারের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

ইউপিআর ফোরামের পক্ষ থেকে উত্থাপিত ইস্যুগুলো

সর্বজনীন পুনর্বীক্ষণ প্রক্রিয়া চলাকালীন ফোরামের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত ইস্যুতে সরকারের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার আদায়ে অ্যাডভোকেসি ও লবি পরিচালনা করা হয়।

যুদ্ধাপরাধের বিচার

১. বিচারহীনতার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং আগ্রাসনের অপরাধ তদন্ত ও বিচারের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ।

জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার

২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে স্পষ্ট অঙ্গীকার করা। মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিশেষ করে বিভিন্ন সরকারের আমলে পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী এবং র‍্যাবসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতনের দ্রুত, পর্যাপ্ত নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের বিচার করা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩. গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার ও রিমান্ডের বিষয়ে (ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ এবং ১৬৭ ধারা) হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন। সরকারি ১চাকরিজীবীদের বিচারে অন্তরায় বিভিন্ন আইনি বিধান, যেমন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ও ১৩২ ধারা বাতিল করা এবং ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন বাতিল করে একটি নতুন পুলিশ আইনের জন্য জনমত সংগ্রহসহ আইন প্রণয়ন করা ।

৪. ছোটখাট অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারাধীন বন্দিদের জামিন ও প্যারোলের ব্যবস্থা এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে নিয়মিত কারাগার পরিদর্শনের সুযোগ দেয়াসহ কারাগারে অতিরিক্ত বন্দির চাপ কমাতে পদক্ষেপ গ্রহণ।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

৫. বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা ও তা কার্যকর করা। তথ্য অধিকার আইন অনুমোদন।

৬. মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ফৌজদারি মানহানি, আদালত অবমাননা এবং বই ও চলচ্চিত্রের সেন্সরশিপ সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা।

আবাসনের অধিকার

৭. বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে জোরপূর্বক বস্তিসহ সব ধরনের উচ্ছেদ বন্ধ করা এবং শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কার্যকর পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

জীবীকা নির্বাহের অধিকার

৮. চিংড়ি চাষ, ইকোপার্ক, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি ইত্যাদির মাধ্যমে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃষি জমি ও বনাঞ্চলের ব্যবহারের ফলে কৃষক, সমতলের আদিবাসী এবং চরাঞ্চলের মানুষের উচ্ছেদ বন্ধ করা এবং তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সমতা ও বৈষম্যহীনতা

নারী অধিকার

৯. উত্তরাধিকার, বৈবাহিক সম্পর্ক অধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, শিশুর হেফাজত, অভিভাবকত্ব ও দত্তক নেয়ার ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান পারিবারিক আইনসহ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার।

১০. গার্হস্থ্য সহিংসতা বিরোধী খসড়া আইন যা আইন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সম্পাদিত যৌন হয়রানি বিষয়ক নির্দেশনা -এর উপর জনগণের মতামত সংগ্রহ এবং চূড়ান্তকরণ।

১১. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ এর ক্ষেত্র-মাফিক (বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও কৃষিক্ষেত্রে) বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

১২. জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী

১৩. গণপ্রশাসনে নারী ও সংখ্যালঘুদের জন্য বিদ্যমান কোটা পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং গণপ্রশাসন, বিচার বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।

১৪. অর্পিত সম্পত্তি আইনের অপপ্রয়োগের ফলে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভূমি দখলের সুসংঘবদ্ধ বৈষম্যের প্রতিকার এবং অর্পিত সম্পত্তি (বাতিল) আইন, ২০০১-এর পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষে সংশোধন এবং আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষায় নিজস্ব ভাষায় পাঠদানের ব্যবস্থা চালু করা।

১৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ বাস্তবায়নে বিশেষত ভূমি বিরোধ (নিষ্পত্তি) কমিশন কার্যকর করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে পূর্ণ কার্যক্রম হস্তান্তর করা, শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের জন্য বিশেষ টাস্ক ফোর্স কার্যকর করা, ভূমি দখল প্রতিহত করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ত্বরান্বিত করা।

দলিত জনগোষ্ঠী

১৬. বর্ণবৈষম্য রোধে এবং দলিতদের মানবাধিকার রক্ষায় এবং জীবনযাপন ও বৃত্তির অধিকারে বিভেদ, শোষণ এবং বঞ্চনার অবসান ও ভূমি দখল, ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও সহিংসতা বন্ধে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

ভাষাগত সংখ্যালঘু

১৭. উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দাবি করে তাদের আবাসন ও পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রতিবন্ধী জনগণ

১৮. প্রতিবন্ধীদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সামগ্রিক পুনর্বাসন সুবিধাদি, সব ধরনের স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

শ্রমিক অধিকার

১৯. শ্রম আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন– যেমন পর্যাপ্তসংখ্যক দক্ষতাসম্পন্ন শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ, জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন, ক্রমবর্ধমান হারে, কর্মস্থলে–

বিশেষ করে নির্মাণ শিল্পে মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনায় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শ্রমিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য গঠিত জাতীয় কাউন্সিলের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং কৃষি শ্রমিক ও গৃহ শ্রমিকদের জন্য আইনগত সুরক্ষার পরিধি বর্ধিত করা।

২০. অদক্ষ অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য আবশ্যিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, নিয়োগকারী (রিক্রুটিং এজেন্সি) সংস্থাগুলোর নিবন্ধন ও তদারকি নিশ্চিতকরণ এবং অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোর সাথে জোরদার দ্বিপক্ষিয় সম্পর্ক তৈরি ও জোরদার করা।

শিশু অধিকার

২১. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শ্রম খাতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হ্রাস করতে তদারকির ব্যবস্থা জোরদার করা, শিশু আইন ১৯৭৪-এর প্রয়োগ পুনর্বীক্ষণ করে শিশুদের সহিংসতা ও শোষণ থেকে রক্ষা করা এবং কিশোর বিচারব্যবস্থা বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনার পূর্ণ বাস্তবায়ন।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং মানবাধিকার রক্ষা

২২. নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিচারপতি নিয়োগ, নিম্ন আদালতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করাসহ বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

২৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত আইনকে প্যারিস নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা এবং স্বাধীন ও কার্যকর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড

২৪. ইতিমধ্যে অনুমোদিত মানবাধিকার চুক্তি যেমন– নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি (আইসিসিপিআর), অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি (আইসিইএসসিআর), বর্ণবৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত চুক্তি (সিইআরডি), নির্যাতনবিরোধী চুক্তি (সিএটি), নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত চুক্তি (সিডও) এবং শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি)– এই আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তির যোগাযোগের কার্যধারা এবং বর্ণবৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত চুক্তি এবং নির্যাতন বিরোধী চুক্তির তদন্ত কার্যধারা গ্রহণ করা।

২৫. নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি, নির্যাতনবিরোধী চুক্তি এবং প্রতিবন্ধী অধিকার সংক্রান্ত চুক্তির অধীনে প্রাথমিক প্রতিবেদন জমা দেয়া এবং সিডও সনদের অধীনে পরবর্তী রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন জমা দেয়া, বিশেষ পদ্ধতির (স্পেশাল প্রসিডিওর) প্রতি উন্মুক্ত আমন্ত্রণ প্রেরণ অথবা দেশ পরিদর্শনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির অনুরোধ গ্রহণ করা। তাছাড়া আন্তর্জাতিক চুক্তির অঙ্গীকারগুলো রাষ্ট্রীয় আইনে বাস্তবায়ন করতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ।

২৬. সরকার এখন পর্যন্ত অনুমোদন করেনি এমন মানবাধিকার চুক্তি, যেমন- শরণার্থী বিষয়ক কনভেনশন, অভিবাসী শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন, বলপূর্বক অন্তর্ধান বিষয়ক

চুক্তি, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯, নির্যাতনবিরোধী চুক্তির ঐচ্ছিক প্রটোকল এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তির ঐচ্ছিক প্রটোকল অনুমোদন।

২৭. সিডও ২০০৪, সিইআরডি ২০০১ এবং সিআরসি ২০০৩-এর সমাপনী মন্তব্য অনুসারে– জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধকতার ভিত্তিতে বৈষম্য সৃষ্টির শাস্তি প্রদান, এর বিধান সংবলিত আইন প্রণয়ন এবং উপযুক্ত জাতীয় ট্রাইব্যুনাল ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরাপত্তা ও প্রতিকার নিশ্চিত করা।

জাতীয় আইনে শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) মেনে চলা, বিশেষত বিয়ে ও ফৌজদারি দায়-এর ন্যূনতম বয়স, শিশুশ্রম, শিশুদের প্রভাবিত করে এমন ক্ষতিকর গতানুগতিক চর্চার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের তরফে বাংলাদেশের প্রতি সুপারিশ

সামগ্রিক মানবাধিকার বিষয়ক

১. সাধারণভাবে নাগরিকের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিবেচনায় সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতির অগ্রগতির জন্য নীতি ও কর্মসূচির ক্রমাগত উন্নতি সাধনের সুপারিশ করে নাইজেরিয়া। তাছাড়া সাধারণ জনগণের মধ্যে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কৌশলগত ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে মাঠ পর্যায়ে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায় আজারবাইজান।

নারী অধিকার বিষয়ক

২. নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী ও শিশুর প্রতি বিদ্যমান সব ধরনের বৈষম্য দূর করার জন্য এ বিষয়ক সব আইন ও নীতির পূর্ণ ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য বিমোচন ও দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, জাতীয় নেতৃত্বে লৈঙ্গিক ভূমিকা উন্নয়নে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা অন্যদের সাথে আদান-প্রদান অব্যাহত রাখা এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, জনসচেতনতা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ– এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারি ও তদারকি বৃদ্ধি এবং নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে একটি ব্যাপক কর্মকৌশল গ্রহণের সুপারিশ উত্থাপিত হয় থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, কিউবা, লাওস, মালয়েশিয়া এবং কোরিয়ার পক্ষ থেকে।

৩. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা ও সহযোগিতা নিয়ে দেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করে আলজেরিয়া।

শিশু অধিকার বিষয়ক

৪. শিশু অধিকার সনদের বিধানগুলো বিবেচনায় আনা, শিশুদের প্রতি সব রকম সহিংসতা বন্ধে আরও পদক্ষেপ নেয়া, শারীরিক শাস্তিসহ ফৌজদারি দায়-এর ন্যূনতম বয়সসীমা বৃদ্ধি করা, শিশু অধিকারের ক্ষেত্রে জাতীয় আইন ও এর প্রায়োগিক দিক পুনর্বিবেচনা করে

এগুলোকে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা, বিশেষ করে অপহরণ ও পাচার থেকে সুরক্ষার ক্ষেত্রে ও কিশোর বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কারাবন্দি বা আটক কিশোরদের যোগাযোগের পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে এবং তাদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ সহ শিশু অধিকার রক্ষায় বিদ্যমান আইনগুলো বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অবিলম্বে জোরদার করার সুপারিশ করা হয় ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল এবং চেক রিপাবলিকের পক্ষ থেকে।

৫. শিশু শ্রম দূর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন, জাতীয় শিশু শ্রম নীতি চূড়ান্ত করা এবং অত্যন্ত খারাপ ধরনের শিশু শ্রম নির্মূলে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং জাতীয় শিশু শ্রম নীতির বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সুপারিশ করে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক এবং নেদারল্যান্ডস।

সংখ্যালঘু অধিকার বিষয়ক

৬. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগগুলো তদন্ত করা, শিক্ষামূলক বা সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই বিষয়গুলোকে আলোচনায় আনা এবং বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য রোধে অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায় যথাক্রমে হলি সি এবং যুক্তরাজ্য।

৭. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করার সুপারিশ করে অস্ট্রেলিয়া এবং নরওয়ে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার বিষয়ক

৮. আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি উৎসাহিত করার মাধ্যমে ধর্মীয় স্বাধীনতার সুরক্ষা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করার সুপারিশ করে ইতালি।

শরণার্থী অধিকার বিষয়ক

৯. মেক্সিকো শরণার্থীদের মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে ।

মৃত্যুদণ্ড বিলোপ বিষয়ক

১০. মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করার জন্য ফ্রান্স, ব্রাজিল, চিলি এবং ইতালি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করে। এর মধ্যে ফ্রান্স মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করা এবং এই সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত দণ্ডাদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি বিলম্বনাধিকার প্রণয়ন করার সুপারিশ করে; ব্রাজিল সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত ৬২/১৪৯-এর আলোকে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করার উদ্দেশ্যে শাস্তির বিলম্বনাধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়; মৃত্যুদণ্ড বিলোপের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে এর ওপর একটি মুলতবি ঘোষণা করার আহ্বান জানায় চিলি; প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের পরিসর সংকোচনের লক্ষ্যে মৃত্যুদণ্ড সংবলিত আইন সংশোধনের কথা বিবেচনা করা ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার (২০০৭ ও ২০০৮-এ গৃহীত সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তে যা প্রতিফলিত হয়েছে) সাথে সাথে জাতীয় আইন প্রণয়নে মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে মৃত্যুদণ্ডের ওপর একটি মুলতবি প্রস্তাব গ্রহণ করার সুপারিশ করে ইতালি।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতন বন্ধ এবং কারা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য উদ্যোগ নেয়ার সুপারিশ করে নেদারল্যান্ডস।

সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মী বিষয়ক

১২. সাংবাদিকসহ মানবাধিকার কর্মীদের রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে অস্ট্রেলিয়া এবং নেদারল্যান্ডস।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার বিষয়ক

১৩. দারিদ্রদূরীকরণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে সৌদি আরব, ভিয়েতনাম, জিম্বাবুয়ে, বাহরাইন, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের তরফে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে, বিশেষ করে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ২০০৫ সালে গৃহীত কর্মকৌশল চালু রাখার সুপারিশ করে সৌদি আরব। সামাজিক সুরক্ষা ও সহায়তার কর্মসূচি, বিশেষ করে খাদ্য বিনিময়, নাজুক গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে উন্নয়ন কর্মসূচি, দরিদ্র নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি যা এই জনগোষ্ঠীর জন্য ইতিবাচক ফল দিয়েছে; এসব কর্মসূচি সংহত করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি না করা এবং নাগরিকদের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে চলমান প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছে ভিয়েতনাম। দারিদ্র্য ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চাকরির সুযোগ সৃষ্টি এবং সামাজিক সেবা প্রদান কর্মসূচির সুপারিশ করেছে বাহরাইন।

১৪. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের, বিশেষ করে মহিলাদের গর্ভধারণকালীন স্বাস্থ্য ও জন্মদান-পরবর্তী সেবার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক জাতীয় কৌশল অব্যাহত রাখা এবং বৈষম্যহীনভাবে সবাইকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জাতীয় পরিকল্পনা তৈরির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে যথাক্রমে সৌদি আরব এবং বাহরাইন।

১৫. নারী শিক্ষাসহ শিক্ষার অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রচেষ্টা চালু রাখা এবং জনগণের শিক্ষার মানোন্নয়নে অধিকতর অগ্রগতির জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার সুপারিশ করেছে যথাক্রমে কিউবা এবং চীন।

১৬. খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে এবং দারিদ্র্য মোকাবেলায়, বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে এর অভিজ্ঞতা ও সর্বোৎকৃষ্ট চর্চা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে বিনিময় করার সুপারিশ করেছে মালয়েশিয়া।

১৭. আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে ভুটান, কম্বোডিয়া, সুদান এবং আলজেরিয়া। বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা ও সহযোগিতা নিয়ে দারিদ্র্য, বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে বস্তুগত ও অবস্তুগত দারিদ্র্য (বঞ্চনা অর্থে) মোকাবেলায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায় আলজেরিয়া। আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও শিক্ষাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে ভুটান। জাতীয় প্রতিবেদনে উল্লিখিত সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং বিশেষ করে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে এবং মানবাধিকার ও উন্নয়নকে ব্যাহত

করে এমন সব পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষতা তৈরি এবং কৌশলগত সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চাওয়া এবং অন্যান্য স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে এর সামাজিক প্রতিরক্ষা ব্যূহ ও ক্ষমতায়নের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুপারিশ করে সুদান।

১৮. বাংলাদেশের প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষতা তৈরি ও কৌশলগত সহায়তার অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানানোর সুপারিশ করে ভিয়েতনাম।

নীতি ও কর্মকৌশল বিষয়ক

১৯. জাতীয় সমস্যাগুলো যেমন– দায়হীনতার সংস্কৃতি, বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড এবং নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণ মোকাবেলায় নতুন মাত্রা যোগ করার জন্য একটি জাতীয় মানবাধিকার কর্মসূচি প্রণয়নের সুপারিশ করে মেক্সিকো।

২০. বিচার পরিচালনের জন্য এবং পুলিশ, বিচার বিভাগ, সরকার ও নাগরিক সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি জাতীয় কর্মকৌশল গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানায় যুক্তরাজ্য।

আইন ও বিচার বিষয়ক

২১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দায়হীনতা দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নাগরিকদের নির্যাতন ও হয়রানির জন্য নিজ দায়িত্বে কাজ করা সব কর্মকর্তা ও ব্যক্তির জবাবদিহিতার ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি এবং চেক প্রজাতন্ত্র।

২২. শিশু ও লৈঙ্গিক ধারণা এবং পরিচয়ের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের সহিংসতা ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও বিচারিক কর্মকর্তাদের অধিকতর ভূমিকা নেয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে মানবাধিকার ও নারী, শিশু ও লৈঙ্গিক ধারণা ও পরিচয়ের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার সুপারিশ করে চেক প্রজাতন্ত্র।

২৩. দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা, যা 'প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ' যৌনতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে, বাতিল করার কথা বিবেচনা করার সুপারিশ করে চিলি এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য না করা এবং এক্ষেত্রে সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানায় চেক প্রজাতন্ত্র।

২৪. বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগ এবং বৈষম্যমূলক বিভিন্ন আইনের সংশোধনের সুপারিশ করে বিভিন্ন রাষ্ট্র। বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে নারী অধিকার রক্ষা নিশ্চিত করা, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সামগ্রিকভাবে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করে নেদারল্যান্ডস। সিডও-এর সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড প্রণয়ন করার সুপারিশ করে নরওয়ে এবং নেদারল্যান্ডস। বিদ্যমান আইন যেমন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক সম্পর্কিত আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে যেন নারী অধিকার নিশ্চিত হয় সেজন্য ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে অস্ট্রেলিয়া। বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ থেকে শিশুদের রক্ষা করতে এর প্রচেষ্টা আরও জোরালো করার আহ্বান জানায় লিচটেনস্টেইন। মিশ্র

বিবাহের ক্ষেত্রে মায়ের দিক থেকে শিশুর নাগরিকত্ব পাওয়ার ব্যাপারে আইনের যে বৈষম্যমূলক বিধানগুলো আছে তা প্রয়োজনে সংশোধন করার সুপারিশ করে চেক রিপাবলিক। তাছাড়া, পারিশ্রমিকে বৈষম্য দূর করতে এবং সব সরকারি-বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করতে একটি সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করে নরওয়ে।

২৫. বিচার বিভাগকে শক্তিশালী করা ও এই বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায় ভূটান এবং অস্ট্রেলিয়া।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিষয়ক

২৬. মানবাধিকার পরিস্থিতির কার্যকর তদারকির জন্য জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের কাজের অগ্রগতির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাসহ জাতীয় মানবাধিকার ব্যবস্থাকে জোরদার করার চলমান প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করার আহ্বান জানায় মিশর।

২৭. মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে প্যারিস নীতির আলোকে ক্ষমতায়িত করার আহ্বান জানায় যুক্তরাজ্য। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করার সুপারিশ করে নেদারল্যান্ডস ও অস্ট্রেলিয়া।

আন্তর্জাতিক সনদ অনুসমর্থন ও সংরক্ষণ প্রত্যাহার

২৮. নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের প্রথম (ব্যক্তিগত অভিযোগ পদ্ধতি) এবং দ্বিতীয় (মৃত্যুদণ্ড রহিত সংক্রান্ত) ঐচ্ছিক প্রটোকল অনুসমর্থনের আহবান জানায় চিলি, নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক সনেদর ঐচ্ছিক প্রটোকল অনুসমর্থনের সুপারিশ করে ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, চিলি, চেক রিপাবলিক ও লিচটেনস্টেইন। অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ অনুসমর্থনের আহ্বান জানায় চিলি, আজারবাইজান ও মেক্সিকো। বলপূর্বক অন্তর্ধান বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ অনুসমর্থনের সুপারিশ করে চিলি ও মেক্সিকো। বাংলাদেশ যেসব চুক্তির পক্ষে সেসব চুক্তির অধীনে অন্যান্য অভিযোগ পদ্ধতি (যেমন– ব্যক্তিগত অভিযোগ পদ্ধতি) মেনে নেয়ার আহ্বান জানায় নরওয়ে। বাংলাদেশ এখনও পক্ষ হয়নি, এমন অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর বা অনুসমর্থন করার বিষয়টি বিবেচনার সুপারিশ করে স্লোভেনিয়া। ১৯৫১ সালের শরণার্থী বিষয়ক কনভেনশন অনুসমর্থনের সুপারিশ করে ব্রাজিল, চিলি, চেক রিপাবলিক এবং মেক্সিকো এবং আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন দেয়ার আহ্বান জানায় মেক্সিকো ।

২৯. ইতিমধ্যে অনুমোদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ যেসব সংরক্ষণ রেখেছে তা পুনর্বিবেচনার আহবান জানায় স্লোভেনিয়া। নারীর প্রতি বিদ্যমান সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদের অনুচ্ছেদ ২ এবং ১৬ (১) (গ)-র ওপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহারের আহ্বান জানায় ফ্রান্স এবং নরওয়ে।

৩০. আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে চলমান প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায় সুদান। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারা অনুযায়ী

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিগুলোর সাথে সঙ্গতি রাখতে মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার সুপারিশ করেছে লাওস। জাতীয় আইন ও স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চলমান প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে মিসর।

জাতিসংঘের বিশেষ পদ্ধতি বিষয়ক

৩১. সব বিশেষ পদ্ধতির প্রতি উন্মুক্ত আমন্ত্রণ প্রেরণের সুপারিশ করে চেক রিপাবলিক ও মেক্সিকো, সংক্ষিপ্ত বিচার বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষ প্রতিবেদককে (স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার) আমন্ত্রণ করার বিষয়কে ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করার সুপারিশ করে ব্রাজিল।

আন্তর্জাতিক চুক্তি কাঠামোতে প্রতিবেদন দাখিল

৩২. আন্তর্জাতিক চুক্তি কাঠামোতে প্রতিবেদন দাখিলের কর্তব্য সম্পাদনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে সামর্থ্য অর্জনের আহ্বান জানায় মিসর।

সর্বজনীন পুনর্বীক্ষণ প্রক্রিয়া

৩৩. এই পুনর্বীক্ষণ পরবর্তী তত্ত্বাবধানে নাগরিক সমাজের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সুপারিশ করে যুক্তরাজ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পেশকৃত রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন

অনুবাদঃ মামুনুর রশীদ, স্টেপস্

রাষ্ট্র প্রেক্ষিত

১. বাংলাদেশ হচ্ছে একটি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা একক সরকার ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত এবং এর এককক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থায় ৩০০ জন সরাসরি নির্বাচিত সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন। এই ৩০০ জন সদস্যের বাইরে ৪৫টি অতিরিক্ত আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত, যা সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর আসন সংখ্যার সমানুপাতে বরাদ্দকৃত। ১৯৯১ সাল থেকে দেশটিতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, যার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হয়।

২. মূলত একটি পক্ষপাতহীন নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার ধারণাটির উদ্ভব ঘটে। সংসদীয় ব্যবস্থায় একটি নির্বাচিত সরকারের মেয়াদপূর্তির পর নির্বাচনের এই দায়িত্বটি বর্তায় প্রধান উপদেষ্টা[১] ও নির্দিষ্টসংখ্যক (সুপারিশকৃত) উপদেষ্টাদের[২] সমন্বয়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর। গত ১২ জানুয়ারি ২০০৭ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে এমন একটি সময়ে যখন প্রবল রাজনৈতিক বিক্ষোভের মুখে প্রেসিডেন্ট দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন।

৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়, যার মধ্যে অন্যতম ছিল নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা, সরকারি প্রভাবের বাইরে রাখতে নির্বাচন কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের পুনর্গঠন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন এবং সিভিল ও পুলিশ প্রশাসনের বিরাজনীতিকরণ। এই সংস্কার উদ্যোগগুলো মূলত বেশ কয়েক বছর যাবৎই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল যেহেতু সুশাসন, মানবাধিকার ও উন্নয়নের ওপর এগুলোর সরাসরি প্রভাব রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীনই মূলত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় এমন একটি নতুন অধ্যায় সূচিত হয় যার দ্বারা দুর্নীতি, বৈষম্য এবং বঞ্চনা থেকে মুক্তি লাভ করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করতে প্রচেষ্টা চালানো হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে সুশীল সমাজ ও এনজিওরা এই সংস্কার কার্যক্রমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেন, যা এ দেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

৪. বহুত্ববাদ, গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার, জেন্ডার, ন্যায়বিচার এবং নারী ক্ষমতায়নের মূল্যবোধে উজ্জীবিত বাংলাদেশে বিগত কয়েক দশকে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই উদ্যোগগুলোর ফলে বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসনে একটি সফল দৃষ্টান্ত হিসেবে আবির্ভূত হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, এনজিওর প্রসার, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার পাশাপাশি যে বাস্তবভিত্তিক নীতিমালার বাস্তবায়ন এবং কৌশলগত সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয় তার ফলে বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন সূচকে মধ্যম সারির দেশগুলোর একটি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

১. প্রধান উপদেষ্টার মর্যাদা প্রধানমন্ত্রীর সমতুল্য

২. উপদেষ্টাদের মর্যাদা মন্ত্রী পদমর্যাদার

৫. সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের পথে বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিশুদের ভর্তির হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েতে বিরাজমান বৈষম্যও দূর করতে সমর্থ হয়েছে। ২০০৬ সালে শিশুদের টিকা প্রদানের হার মোট জনশক্তির ৮৭.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মা ও শিশু বিশেষ করে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার কমানোসহ গড় আয়ুও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া এমডিজির অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনের পথেও বাংলাদেশের অগ্রগতি সন্তোষজনক।

৬. মানব উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের জন্য দারিদ্র্য এখনও একটি কঠিন বাস্তবতা। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশই দরিদ্র।[৩] এর পাশাপাশি ঐতিহ্যগতভাবে দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল হওয়ায় গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ দেশটির মানবাধিকার ও উন্নয়ন উদ্যোগের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা। দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে দেশটির দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের প্রতি সংঘটিত বৈষম্যগুলো চ্যালেঞ্জ করতে পারে না এবং তাদের অধিকার পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারে না। যেহেতু দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা, তাই একদিকে দারিদ্র্য নিরসনে এবং অন্যদিকে নাগরিকদের মানবাধিকার নিশ্চিতকল্পে দেশটি বেশ কিছু সামগ্রিক এবং বহুমুখী কৌশল গ্রহণ করেছে।

পদ্ধতি

৭. ইউপিআর প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে সুশীল সমাজ, এনজিও[৪] ও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার সাথে আলোচনার ভিত্তিতে। মানবাধিকার পরিস্থিতির বাস্তব পর্যালোচনা এবং এই রিপোর্টটিকে তথ্যসমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে লিখিত আকারে মতামত গ্রহণ করা হয়, সরকারের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন মুখ্য তথ্য সরবরাহকারীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তথ্য সংযুক্ত করা হয় এবং কিছু নির্বাচিত মানবাধিকার দলিল পর্যালোচনা করা হয়।

আইন ও বিচার কাঠামো

৮. বাংলাদেশের সংবিধানই দেশটির সর্বোচ্চ আইন। নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কিংবা আইন প্রণয়নকারী সংস্থা কোনো আইন তৈরি করতে পারে না। তবে সংসদীয় ক্ষমতাবলে অনুবিধান তৈরি করতে পারে, যেগুলোকে বিধিবিধান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সংবিধানের মূল আদর্শের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ না হলে এই ধরনের বিধান আদালতে প্রয়োগ করা যায়।

৯. আইনের শাসন বাংলাদেশের আইনি কাঠামোর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এটি ইংলিশ কমন ল'র ওপর ভিত্তি করে তৈরি হলেও অধিকাংশ আইনই হচ্ছে সাংবিধানিক আইন, যা সংসদ কর্তৃক প্রণীত এবং উচ্চ আদালতের দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত। হাইকোর্ট ও আপিল

৩. ২০০৫, উৎস: হাউজহোল্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে

৪. যেসব বেসরকারি ও সুশীল সমাজের সংগঠনের সাথে আলোচনা করা হয়েছে তার তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে

বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্ট সংসদে পাসকৃত আইনের ব্যাখ্যা করতে পারে এবং সংবিধানে যেসব মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে তা বাতিল ঘোষণা করতে পারে। হাইকোর্ট বিভাগ সংবিধানের আলোকে নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রেরিত আপিল ও সংশোধনীর ব্যাপারে রিটের মাধ্যমে নির্দেশনা জারি করতে পারে। এটি রিট এখতিয়ার অনুযায়ী অন্যান্য সম্ভাব্য সমাধানের কথাও বিবেচনা করতে পারে। আর আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগ কিংবা অন্য যে কোনো আইন প্রণয়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত আপিলের শুনানি পরিচালনা করতে পারে ।

১০. অর্থ, সম্পদ, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দেওয়ানি আদালতে দাখিল করা যায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী সহকারী জজ বা অতিরিক্ত সহকারী জজের নেতৃত্বে এসব অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। কোনো সংঘটিত অপরাধের বিরুদ্ধে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের পরিচালনায় ফৌজদারি আদালতে অভিযোগ দায়ের করা যায়। এছাড়াও শ্রম আদালত এবং শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে শ্রম অধিকার সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়।

১১. সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ জজ নিয়োগের বিধান রয়েছে। এছাড়াও এসিড সহিংসতাসহ নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিচার নিশ্চিত করার জন্যও বিশেষ আদালত গঠন করা হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্যও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পারিবারিক আদালতের সহকারী জজ রয়েছে। এছাড়া ছোটখাটো বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে রয়েছে গ্রাম আদালত আর শহরাঞ্চলের জন্য পৌর আপোস মীমাংসা বোর্ড। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের বিচার সামরিক আদালতে করা হয়।

১২. অ্যাটর্নি জেনারেল হচ্ছেন সরকারের মুখ্য আইন কর্মকর্তা যার অধীনে রয়েছে অতিরিক্ত, উপ ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল। তারা সুপ্রিম কোর্টে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। সরকারি কৌঁসুলি এবং তার অধীন অতিরিক্ত ও সহকারী সরকারি কৌঁসুলিগণ নিম্ন আদালতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব ও দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করেন। পাবলিক প্রসিকিউটর ও সহকারী প্রসিকিউটর অপরাধ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দায়রা আদালতে এবং জেলা পর্যায়ের দায়রা আদালত পর্যায়ের আদালত বা ট্রাইব্যুনালে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। পুলিশ কর্মকর্তারা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসনের।

মানবাধিকার সংরক্ষণে কাঠামোগত মানদণ্ড

১৩. বাংলাদেশের সংবিধান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আলোকে বেশ কিছু মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। সংবিধানে বর্ণিত অধিকারগুলোর মধ্যে আইনের চোখে সমানাধিকার[৫] এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[৬]

৫. সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদ
৬. সংবিধানের ৩১, ৩৩ নং অনুচ্ছেদ

এছাড়া জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে কারো প্রতি কোনো রকম বৈষম্য করা চলবে না এবং এসব কারণে ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, শরীর, সুনাম কিংবা সম্পত্তিতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগও সংবিধান নিশ্চিত করে।

১৪. সংবিধান যেসব মৌলিক নীতি ও আদর্শ অনুমোদন করে সে অনুযায়ী রাষ্ট্র যেসব বিষয় নিশ্চিত করবে সেগুলো হচ্ছে, জাতীয় জীবনে নারীর অংশগ্রহণ, বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সমান সুযোগ, সব কাজের ক্ষেত্রে অধিকার ও দায়িত্ব দুটিকেই মাথায় রাখা, স্থানীয় উন্নয়ন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার রক্ষায় এই মূল নীতি বা আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

১৫. মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে বাংলাদেশের আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি বা নীতিতে দেশটির অনুমোদন কিংবা সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

- সব ধরনের জাতিগত বৈষম্য বিলোপ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন ১৯৬৫;
- জাতিগত বিভেদ দমন ও শাস্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ১৯৭৩;
- নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন ১৯৭৯ ও ঐচ্ছিক প্রটোকল ২০০০;
- দাসপ্রথা সংক্রান্ত কনভেনশন ১৯২৬ ও এর তৎপরবর্তী সংশোধিত সংস্করণ ১৯৫৩;
- দাসপ্রথা বিলোপ সংক্রান্ত অতিরিক্ত/সম্পূরক আন্তর্জাতিক কনভেনশন, দাস ব্যবস্থা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান ও রীতিবিরোধী কনভেনশন ১৯৫৬;
- মানব পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও বলপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্তকরণবিরোধী কনভেনশন ১৯৪৯;
- শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ এবং এর দুটি ঐচ্ছিক প্রটোকল ২০০১;
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক সনদ ১৯৬৬;
- গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত সনদ ১৯৮৮;
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক কনভেনশন ১৯৫২;
- বিবাহে সম্মতি প্রদানসহ বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ও নিবন্ধন সংক্রান্ত কনভেনশন ১৯৬২;
- নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ এবং শাস্তিবিরোধী কনভেনশন ১৯৮৪;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক কনভেনশন ২০০৬ ও এর ঐচ্ছিক প্রটোকল;
- দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন ২০০৩।

১৬. এগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের কিছু মূল কনভেনশন অনুমোদন করেছে। যথা:

- জোরপূর্বক শ্রম কনভেনশন (২৯নং), ১৯৩০;
- সংগঠিত হওয়ার অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (কৃষি) (১১নং) ১৯২১;
- সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা সংক্রান্ত কনভেনশন এবং সংগঠিত হওয়ার অধিকার সুরক্ষা আইন (৮৭নং) ১৯৪৮;
- সংগঠন করার এবং সম্মিলিতভাবে দাবি-দাওয়া উত্থাপনের অধিকার (৯৮নং) ১৯৪৯।

১৭. ২০০৬ সালে মানবাধিকার কাউন্সিলে নির্বাচিত হওয়ার আগে বাংলাদেশ যেসব স্বতঃপ্রণোদিত প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দিয়েছিল, সেগুলো বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়। যেমন–

- স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন নিশ্চিত করা;
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা;
- নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা;
- জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে, বাস্তবসম্মত জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার মাধ্যমে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ধারাবাহিক পদক্ষেপ নেয়া।

মানবাধিকার পরিস্থিতি

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার

১৮. বাংলাদেশের সংবিধান সব নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সংরক্ষক। আইনের চোখে সমানাধিকার ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার এসব মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি বৈষম্যমূলক আচরণ ও বলপূর্বক শ্রমের বিরুদ্ধে সংবিধান সুরক্ষা হিসেবে কাজ করে। গ্রেফতার, হাজতবাস, বিচার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও সংবিধান রক্ষাকবচ। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও সভা-সমিতি করার অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পেশা, ধর্ম, সহায়-সম্পত্তি, বাসস্থান ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারও সংবিধান রক্ষা করে। এই অধিকারগুলোই মূলত একটি ন্যায়বিচার, স্বাধীন ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে।

১৯. বাংলাদেশের স্বাধীন গণমাধ্যম, শক্তিশালী সুশীল সমাজ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সেপ্টেম্বর ২০০৮-এ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়িত হওয়ায় তথ্যের অভিগম্যতা ও তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথকে প্রশস্ত করেছে।

২০. বাংলাদেশের বেসরকারি সংগঠনগুলো ক্ষুদ্রঋণ, স্বাস্থ্যসেবা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জনস্বার্থমূলক

মামলা সুশাসন সংক্রান্ত অনিয়ম, অবৈধ হাজতবাস এবং নাগরিকের আইনসম্মত অধিকার রক্ষায় প্রয়োগ করা হয়।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার

২১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, মৌলিক পরিসেবা, সরকারি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক সংস্কার, কৃষির উন্নয়ন এবং গ্রামীণ ও পৌর অবকাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ব্যক্তিউদ্যোগভিত্তিক শিল্পোদ্যোগকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সরকার বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকারের গৃহীত শিল্প নীতিতে নারী উদ্যোক্তা ও কর্মীদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের কথা বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ব্যক্তিউদ্যোগের ক্ষেত্রে খাতভিত্তিক সর্বনিম্ন মজুরিও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ২০০৭ সালে অপ্রশিক্ষিত শ্রমিকের জন্য জাতীয় সর্বনিম্ন মজুরি ঘোষিত হয়েছে।

২২. দুর্বল ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ড ও পেনশন ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়। সংবিধানে উল্লিখিত মূল নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রাধিকার খাতগুলো চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশের আদালত সংবিধানে বর্ণিত মূল নীতিমালা এবং রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের আলোকে সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে যা জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির মাধ্যমে একটি ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার

ক. নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন

২৩. বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত বাধ্যবাধকতা[৭] ও সিডও সনদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নারীর অবস্থার উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন ধারাবাহিক উদ্যোগ ও কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে।

২৪. সরকারের বিপুল উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় নারীরা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ক্রমবর্ধমানহারে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। নারীরা সংসদের ৩০০টি সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। এছাড়া সংসদে সংরক্ষিত ৪৫টি আসনের পাশাপাশি মিউনিসিপ্যালিটিসহ সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে এক-তৃতীয়াংশ নারী অংশগ্রহণের সুযোগ পান। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বিচার বিভাগ ও সরকারি চাকরিতে যোগদানের জন্য সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। সরকারি চাকরিতে ১০ ভাগ কোটা নারীদের জন্য নির্দিষ্ট। এ দেশের নারীরা বর্তমানে রাষ্ট্রের নির্বাহী, বিচার ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলেও নারীরা কাজ করছে।

২৫. গ্রামীণ জীবনধারণ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন, অর্থনৈতিক প্রসার, শহরাঞ্চলে গ্রামের লোকের আগমনের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতে নারীদের একক বৃহত্তম অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা

৭. অনুচ্ছেদ ১০, ২৮

উপার্জনের একটি বড় অংশ আসে নারী অভিবাসী শ্রমিকদের পাঠানো আয় থেকে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমেরও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সুবিধাভোগী নারী।

২৬. নারী উন্নয়নে বাংলাদেশে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর রয়েছে। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি সিডও বাস্তবায়নে অগ্রগতিসহ নারী উন্নয়নে অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে থাকে। পাসপোর্টসহ সব গুরুত্বপূর্ণ দলিল বা সনদে পিতার পাশাপাশি মায়ের নাম লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধেও বিশেষ আইন চালু করা হয়েছে।

খ. শিশুদের অধিকার

২৭. শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদের প্রথম দিকের স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সনদে বর্ণিত লক্ষ্যগুলো অর্জনে এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা তথা এর সাথে সম্পর্কিত জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক বিশেষ অধিবেশন ১৯৯২-এ গৃহীত বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

২৮. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পুষ্টি, টিকাদান, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পানি ও স্যানিটেশনে বাংলাদেশ প্রশংসাযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। শিশুর বিকাশের সব ক্ষেত্রে জেন্ডার বিভাজন কমানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। শিশুদের অধিকার ও কল্যাণে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মসূচির সমন্বয় করে থাকে, যেমন যুবসমাজের জন্য ঋণ ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। জাতীয় শিশু কাউন্সিল শিশু অধিকার সংক্রান্ত আইন ও অধিকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণের চূড়ান্ত নীতি-নির্ধারনী সংস্থা। আন্তঃমন্ত্রণালয় সিআরসি কমিটি শিশু অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও অন্যান্য কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সমন্বয় করে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী শিশুদের সাংস্কৃতিক ও মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

গ. সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার

২৯. বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাস করে এবং তারা যুগের পর যুগ পূর্ণ সম্প্রীতির সাথেই বসবাস করে আসছে। মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা করে থাকেন। প্রতিটি ধর্মের বিশেষ উৎসবের সময় বিবেচনা করে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালনে বিশেষ উৎসব ভাতার ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রতিটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার আলাদা কল্যাণ তহবিল গঠন করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে উপাসনালয় নির্মাণ ও মেরামতের জন্য তহবিল।

৩০. এ দেশে অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে যারা সমতল ও পার্বত্য উভয় অঞ্চলেই বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় সবচেয়ে বেশিসংখ্যক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস যারা বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা করে থাকেন।

৩১. সংখ্যালঘু বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঁচ শতাংশ আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রেও তারা বিশেষ কোটা সুবিধা পায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর জন্য (বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্যও) পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে।

মানবাধিকার সুরক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল প্রতিষ্ঠানগুলো

সুপ্রিম কোর্ট

৩২. সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনি প্রতিষ্ঠান যা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত আইনের পর্যালোচনা করার এখতিয়ার রাখে এবং তা সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেটা নিশ্চিত করে। কোনো নাগরিক যদি তার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে এই মর্মে কোনো রিট পিটিশন দায়ের করে তবে তা সুপ্রিম কোর্ট বিবেচনায় নিতে এবং সে বিষয়ে নির্দেশনা জারি করতে পারে।

৩৩. বাংলাদেশের সংবিধান[৮] সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগকে সংবিধানে[৯] প্রদত্ত মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। মৌলিক অধিকার[১০] সংরক্ষণের প্রশ্ন তুলে যে কোনো ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের সহায়তা চাইতে পারেন। একজন অভিযোগকারী হাইকোর্টের শরণাপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে পাঁচ রকমের রিট দায়ের করতে পারেন। যথা: নিষেধাজ্ঞামূলক, ম্যান্ডামাস, হেবিয়াস কর্পাস এবং কো-ওয়ারেন্টো।[১১]

৩৪. ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৫৬১ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ যদি মনে করেন যে, কোনো আদালতের রায়ে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয়েছে তবে তা রোধ করতেও হাইকোর্ট বিভাগ যে কোনো নির্দেশ জারি করতে পারেন। হাইকোর্টের এই ক্ষমতা সামরিক শাসন অবস্থা জরুরি ব্যবস্থা চলাকালীনও বহাল থাকে এবং মৌলিক অধিকার রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

৩৫. ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিন সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্ত করতে পারবে, অভিযোগ প্রমাণিত হলে কমিশন নিজেই এই বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে পারে অথবা আদালতের/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে করতে পারে। দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতিও এই কমিশন পর্যবেক্ষণ করবে।

৮. অনুচ্ছেদ-১০২(১)

৯. অনুচ্ছেদ ২৬-৪৩

১০. অনুচ্ছেদ ৪৪(১)

১১. অনুচ্ছেদ ১০২

অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

আইন কমিশন

৩৬. আইন কমিশন অ্যাক্ট ১৯৯৬ অনুযায়ী একটি আইন কমিশন গঠিত হয়েছে, যা আদালতের বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণ উদ্ঘাটন করতে প্রচলিত আইনের সংস্কারের সুপারিশ দিতে এমনকি নারী, শিশু ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে এমন আইন প্রণয়ন অথবা বিলুপ্ত করার সুপারিশ করতে পারে।

জাতীয় আইন সহায়তা সংগঠন

৩৭. প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আইনি সহায়তা লাভের জন্মগত প্রতিবন্ধকতাকে স্বীকার করে তাদের ন্যায়বিচার লাভের পথ সুগম করতে সরকার আইন সহায়তা আইন ২০০০ প্রণয়ন করে এবং তার আওতায় দরিদ্র ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের আইন সহায়তা দিতে জাতীয় আইন সহায়ক সংগঠন গঠন করে।

অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস

৩৮. সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসেস অর্ডিন্যান্স ২০০৮ অনুযায়ী একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের আইন বিষয়ক কর্মকর্তাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং পরিচালনা করা যাতে তারা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা ও উপজেলা আদালতে সরকারের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারে।

দুর্নীতি দমন কমিশন

৩৯. জাতীয় সংসদের একটি আইনবলে ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠিত হয়। এই আইনটির উদ্দেশ্য ছিল মূলত একটি স্বাধীন ও কার্যকর দুর্নীতি দমন সংস্থা প্রতিষ্ঠা যা স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে পারে। সংস্থাটি মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা, দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনগত প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা, সম্পদ ও দেনার হিসাব চাওয়া, উল্লেখকৃত উৎসের চাইতে অতিরিক্ত আয়ের সন্ধান পাওয়া গেলে সম্পত্তি দখল বা বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অধিকতর স্বাধীনতা ও ক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭-এ দুদকের কার্যপ্রণালি বিধিমালা পুনর্গঠন করা হয়।

রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন

৪০. বাংলাদেশ সরকার সরকারি পরিসেবাদান প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন গঠন করে যেটি সরকারকে এ বিষয়ে নিয়মিত বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে। এই প্রতিষ্ঠানে সরকার ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও আছেন। কমিশনের সুপারিশক্রমে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে "সিটিজেন'স চার্টার" গ্রহণ করা হয়েছে।

ন্যায়পাল

৪১. বাংলাদেশের সংবিধানে[১২] সংসদের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন বিধির মাধ্যমে ন্যায়পাল নিয়োগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার আওতায় যে কোনো মন্ত্রণালয় কিংবা সরকারি কর্মকর্তা অথবা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত যে কোনো কাজের তদন্ত করা

১২. সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদ

যায়। ১৯৮০ সালে ন্যায়পাল আইন প্রণীত হয় যেখানে বলা হয়েছে সংসদ ন্যায়পাল নির্বাচিত করবে।

কর ন্যায়পাল

৪২. কর ন্যায়পাল নিয়োগ সংক্রান্ত আইন ২০০৫ সালে সংসদে গৃহীত হয়। কর ন্যায়পালের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে আয়কর প্রদানকারীদের অভিযোগ গ্রহণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে জবাবদিহি করা এবং যে কোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

৪৩. সরকার দেশের ছয়টি বিভাগে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) চালু করেছে যা মেডিকেল কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকার নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের বাছাইকৃত কিছু এনজিওর মাধ্যমে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেছে। ওসিসিতে নির্যাতন ও পাচারের শিকার নারী এবং শিশুরা জরুরি চিকিৎসা সেবা, পুলিশি সহায়তা, আইনি সাহায্য, মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং এবং নিরাপত্তা হেফাজতে আশ্রয় সেবা পেয়ে থাকে। সুনির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক থানায় নারীদের জন্য পৃথক সেলের ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে।

৪৪. ওসিসির কাজে সহায়তার জন্য ছয়টি ডিএনএ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে ধর্ষণ, খুন, পিতৃত্ব, উত্তরাধিকার, অভিবাসন এবং নিখোজ ব্যক্তি ও বিকৃত মানবদেহ শনাক্তকরণ সংক্রান্ত তদন্ত কাজে সুবিধা হচ্ছে।

৪৫. বাংলাদেশ নারী ও শিশু পাচার রোধে কার্যকর অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রচার-প্রচারণা, নারীর ক্ষমতায়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকির ফলে এটা সম্ভব হয়েছে।

৪৬. নারী নির্যাতন দমনে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একটি কেন্দ্রীয় সেল গঠন করা হয়েছে। ১৫ সদস্যের একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি এর পর্যবেক্ষণ করে। মহিলা বিষয়ক ডিপার্টমেন্টে ও জাতীয় মহিলা সংস্থায়[১৩]ও এরকম সেল গঠিত হয়েছে। স্পর্শকাতর ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি পর্যবেক্ষণ উপ-কমিটিও গঠিত হয়েছে।

মিডিয়া

৪৭. বাংলাদেশের মিডিয়া খুবই স্বাধীন যা মানবাধিকার ইস্যুসহ উন্নয়ন, শাসন এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বিষয়ে বিতর্ক ও আলোচনার সূত্রপাত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। প্রায় ৫৪৪টি দৈনিক, ৩৫৭টি সাপ্তাহিক, ৩২টি পাক্ষিক এবং ৯৩টি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় যার ছাপার পরিমাণ বিশ লক্ষাধিক। বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও রেডিওর সম্প্রসারণও বেশ উল্লেখযোগ্য। পত্রপত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া উভয়ই সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, সরকারের অনিয়ম ও সামাজিক সহিংসতার ব্যাপারে সোচ্চার। জেন্ডার, নাগরিক অধিকার ও বৈষম্যের বিভিন্ন বিষয়েও মিডিয়ায় বিভিন্ন নিবন্ধ কিংবা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন ও সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রদান নিশ্চিত করতে সরকার সারাদেশে কমিউনিটি রেডিও চালুর অনুমতি দিয়েছে।

১৩. National Women's Organization

সুশীল সমাজ

৪৮. সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের সুশীল সমাজ একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শক্তিশালী অবদানের জন্য সর্বজনবিদিত। জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট আইনি তৎপরতাসহ বিভিন্ন নাগরিক আন্দোলনে সুশীল সমাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যা সরকারকে সর্বদাই তাদের ভূমিকা কিংবা নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে জবাবদিহি করতে বাধ্য করছে এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণে বাধা প্রদান করছে। বেসরকারি এবং স্থানীয় সংগঠনগুলোর বহুমাত্রিক কর্মসূচির মাধ্যমে এটি আরো সুসংহত হচ্ছে। স্থানীয় ইস্যু সম্পর্কে ধারণা থাকা এবং তৃণমূলের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার সুবাদে এনজিওগুলো মানবাধিকার এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্রঋণ ও আয়মূলক কাজ, ন্যায়বিচার প্রাপ্তি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ থেকে শুরু করে উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনজিওগুলো কাজ করে।

৪৯. এটা অনস্বীকার্য যে, এনজিও খাতের আজকের এই প্রসারের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিগত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা বিশাল অবদান রেখেছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৪ হাজার নিবন্ধীকৃত এনজিও রয়েছে। তাদের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্র্যাকের মতো কিছু কিছু এনজিও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। বস্তুত জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকার এবং এনজিওদের যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার ফলেই মানবাধিকার, সুশাসন এবং উন্নয়নমূলক কাজে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

ইতিবাচক দৃষ্টান্ত

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণ

৫০. একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অপরিহার্য। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সবসময়ই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছে। তবে নিম্ন আদালতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা (ধারা ২২) থাকা সত্ত্বেও এই আদালতগুলো দীর্ঘদিন ধরে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকেছে, যা তাদের নিরপেক্ষতা এবং সততা বজায় রাখার ক্ষেত্রে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটকে একই সঙ্গে সরকারি নির্বাহী কর্মকর্তা এবং আইন কর্মকর্তার দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে হয়েছে।

৫১. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুনর্বিন্যাস) আদেশ ১৯৮০ (সংশোধনী ১৯৮৬) অনুযায়ী আইন কর্মকর্তার নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ১৯৯৯ সালে একটি রিট দায়ের করা হয়, যাতে একে সংবিধানের পরিপন্থী বিভাগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ওই নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ আসলেই সংবিধানের পরিপন্থী – এ মর্মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ একমত পোষণ করে এবং সংবিধানের ১১৫ ধারা অনুযায়ী একটি পৃথক জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেয়।

৫২. রাষ্ট্রপতি ২০০৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বহুল প্রত্যাশিত এই পৃথককরণ কার্যকর হয় ১ নভেম্বর ২০০৭ তারিখ থেকে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান

৫৩. দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পুনর্গঠন এবং স্বাধীন কার্যক্রম নিশ্চিত করা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি অগ্রাধিকার ছিল, যার ফলে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে দুদক একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। কমিশনের কার্যকারিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ সংস্কার করা হয় এবং দুর্নীতি দমন বিধিমালা ২০০৭ জারি করা হয়। দুর্নীতির মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার এবং তদন্তের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় সমন্বয় কাউন্সিল দুদককে সহায়তা করে। গণমাধ্যম এবং সাধারণ জনগণের সঙ্গে নিয়মিত তথ্য আদানপ্রদান ও মিথস্ক্রিয়ার ফলে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন

৫৪. নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যা ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পূর্ববর্তী নির্বাচন কমিশনারদের পক্ষপাতদুষ্টতা এবং অদক্ষতার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন ২০০৮ সালে সফলভাবে ছবি এবং ব্যক্তিগত তথ্য সংবলিত ভোটার তালিকা তৈরির কাজ সম্পন্ন করে। এই তালিকায় রেকর্ডসংখ্যক ৮ কোটি ভোটার অন্তর্ভুক্ত হয়, যে কোনো মানদণ্ডেই যা একটি অনন্য সাফল্য। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী কাঠামো উন্নয়নের জন্য সব মহলের সঙ্গে আলোচনা করে বেশকিছু তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপও নেয়। কমিশন একটি নির্বাচনী 'রোডম্যাপ' ঘোষণা করে, যাতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার, সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাস, স্থানীয় সরকার ও সংসদীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা এবং স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহারের কথা বলা হয়।

৫৫. গত ৪ আগস্ট ২০০৮ দেশের চারটি সিটি করপোরেশন এবং নয়টি পৌরসভায় অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচন ছিল বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রথম নির্বাচন। পর্যবেক্ষকদের অভিমত অনুযায়ী এই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। প্রার্থীদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগই ওঠেনি। বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ভোটার অংশগ্রহণের সাক্ষী এই নির্বাচন। এতে শতকরা ৭৫ থেকে ৯২ ভাগ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। ভয়ভীতিহীন এবং সহিংসতামুক্ত পরিবেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারীরা বিপুলসংখ্যায় ভোটে অংশগ্রহণ করেছে, এটাও বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম।

স্থানীয় সরকার সংস্কার/পুনর্গঠন

৫৬. বাংলাদেশের সংবিধানে[১৪] প্রশাসনের সব স্তরে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান এবং গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ, শ্রমিক এবং নারীদের প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হয়েছে। ২০০৭ সালের জুনে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়, যা বিভিন্ন পেশাজীবী, রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর স্বায়ত্তশাসন, আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং আরো গণতন্ত্রায়নের জন্য কতিপয় পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করে। কমিটি একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্যও সুপারিশ করে। এই কমিশন গঠনের বিষয়টি এখন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পুলিশ সংস্কার

৫৭. সাধারণ মানুষসহ সংশ্লিষ্ট সবার মতামত নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭-এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা পুলিশ আইন ১৮৬১-এর পরিবর্তে জারি করা হবে। এর মধ্যে পুলিশের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, দায়িত্ব পালনকালে মানবাধিকার রক্ষার জন্য আচরণবিধি, নারী ও শিশুর সঙ্গে আচরণের বিষয়ে জেন্ডার নির্দেশিকা এবং পুলিশ সদস্যদের দায়দায়িত্বের বরখেলাপজনিত শাস্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

৫৮. সরকার মেট্রোপলিটন এবং গ্রামীণ উভয় এলাকায় গণমুখী পুলিশ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত কিছু পুলিশ স্টেশনকে মডেল পুলিশ স্টেশনে রূপান্তর করেছে। পুলিশের সাথে স্থানীয় জনগণের সম্পর্কোন্নয়নের জন্য আইনি সেবা প্রদান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং স্থানীয় জনসাধারণের পারস্পরিক যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য 'পুলিশ ওপেন হাউস ডে' চালু করা হয়েছে।

৫৯. আইন-শৃঙ্খলা এবং মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশ কর্মকর্তাদের ব্যর্থতার অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকার পুলিশ সদর দপ্তরে একটি নিরাপত্তা সেল স্থাপন করেছে। এই সেল আইন-শৃঙ্খলা এবং মানবাধিকার রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য দোষী সাব্যস্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়ারও ক্ষমতা রাখে।

৬০. একটি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এবং ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস ইউনিট স্থাপনের কাজও এগিয়ে চলেছে। প্রথমোক্ত সংস্থাটি অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তির শারীরিক, মনো-সামাজিক এবং আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে পরেরটি অপরাধ বিশ্লেষণ এবং বিশেষ করে মানব পাচারকারী এবং মাদকদ্রব্য চোরাচালানসহ অন্যান্য অপরাধ দমনের সম্ভাব্য পন্থাগুলো নিয়ে কাজ করবে।

শিক্ষার মান উন্নয়ন

৬১. বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা। দেশের উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ১৫ ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়, যার ৬৪% আবার ব্যয় হয় প্রাথমিক শিক্ষাখাতে। ২০০৭ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ভর্তির হার ছিল ৯১.৭ শতাংশ এবং ছাত্রছাত্রীর হার

১৪.অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১১

ছিল ৫০:৫০। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সবগুলো ক্ষেত্রেই বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্যের মাত্রা সাধারণভাবে কমে আসার প্রবণতা দেখা গেলেও শিক্ষাখাতে এটা বেশি চোখে পড়ে।

৬২. শিক্ষা উন্নয়নে সফলতা লাভের জন্য সরকারি প্রচেষ্টা এবং সেসঙ্গে বেসরকারি সহায়তা প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০-এর দ্বারা সরকার সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে। সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক, প্রাথমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং গ্রামীণ মাধ্যমিক স্কুলছাত্রীদের উপবৃত্তি ও স্কুলের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র প্রাথমিক স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা চালু করেছিল। এই কর্মসূচির পরিবর্তে এখন ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য দরিদ্র পরিবারগুলোকে নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

৬৩. দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথ সুগম করেছে। এছাড়া এটি বাল্যবিয়ে হ্রাসের ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়েছে।

৬৪. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও শহরাঞ্চলের শিশুশ্রমিকদের মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি স্থানীয় বাজারমুখী উপার্জনমূলক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে। যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় না তাদের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সমমানের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি বিকল্প মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিচালনা করছে এনজিওগুলো।

দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

৬৫. দারিদ্র্য দূরীকরণ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাতীয় চ্যালেঞ্জ, তাই স্বাধীনতার পর থেকেই যে কোনো নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অগ্রাধিকার পেয়েছে এটি। দেশের জনসাধারণ, যাদের অনেকেই শুধু কোনোমতে জীবনধারণ করে, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত এবং সমন্বিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের অর্ধেকেরও বেশি অংশ নিয়মিত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়।

৬৬. এই কর্মকাণ্ডগুলো বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সাফল্যের সূচনা করেছে। বিশ্বব্যাংকের বর্ণনানুযায়ী বাংলাদেশের তথাকথিত 'নীরব বিপ্লব' উন্নয়নের নতুন এবং আকর্ষণীয় তত্ত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডর-পরবর্তী খাদ্য সঙ্কটও বাংলাদেশ সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করতে পেরেছে। এক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চালের দাম নিয়ে আসার পাশাপাশি কৃষকদের জন্য সময়োপযোগী নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা জরুরি।

৬৭. দরিদ্রদের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তার জন্য সরকার ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নগদ অর্থ হস্তান্তর কর্মসূচি, খাদ্য বিতরণ

কর্মসূচি, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসহ অন্যান্য বিশেষ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে দরিদ্রদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন এবং প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারে তাদের সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে।

৬৮. সরকার এবং এনজিও উভয়েই দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আয়মূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকার উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পাশাপাশি শিশু অপরাধীদের জন্য সংশোধনমূলক সেবা, সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত নারীদের প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন, এতিম, ভবঘুরে এবং সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও লালনপালনের জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৬৯. উপরিউক্ত উদ্যোগগুলো ইতিবাচক ফল অর্জনে সক্ষম হয়েছে। মৌলিক চাহিদার মূল্য (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES) ফলাফলে দেখা গেছে, জাতীয় পর্যায়ে উপার্জন দারিদ্র্যের ঘটনা ২০০০ সালের ৪৮.৯% থেকে ২০০৫ সালে ৪০%-এ নেমে এসেছে। অনুমান করা হচ্ছে যে, নিম্ন দারিদ্র্যসীমা পদ্ধতি ব্যবহার করায় দারিদ্র্যের হার ২০০০ সালের ৩৪.৩% থেকে ২০০৫ সালে ২৫.১% -এ নেমে আসে। একইভাবে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও কমে যাবে।

নতুন আইন/আইনের সংস্কার

৭০. আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রমাণ পাওয়া যায় কিছু অত্যাবশ্যকীয় দেশীয় আইন প্রচলন বা সংস্কার থেকে। যেমন–

- গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ২০০৮;
- তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮;
- ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭;
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০৩-এ সংশোধিত);
- সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ, ২০০৮;
- সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮;
- সরকারি অ্যাটর্নি সেবা অধ্যাদেশ, ২০০৮;
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৭;
- আইন সহায়তা আইন ২০০০ (২০০৬ সালে সংশোধিত);
- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬;
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬;
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬;
- গণ ক্রয় বিধিমালা, ২০০৬;
- ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৪;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪;

- এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২;
- এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২;
- প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১।

৭১. বাংলাদেশ সম্প্রতি নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করেছে। বাংলাদেশ নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন ২০০৮ অনুযায়ী, বাংলাদেশি কোনো নারী বিদেশি নাগরিককে বিয়ে করলে তাদের সন্তান বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অধিকারী হবে। এছাড়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের জন্য একটি আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়নের জন্য সুশীল সমাজের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে।

৭২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ২০০৩ সালে কিছু পরিবর্তন আনা হয় যার মধ্যে ছিল :

ক. শিশুর সংজ্ঞায় ১৪ বছরের নিচের পরিবর্তে ১৬ বছরের নিচের বয়সীদের অন্তর্ভুক্তি অর্থাৎ বয়সসীমা বাড়ানো;

খ. যৌতুকের দাবি এবং এ কারণে নির্যাতনকারী ব্যক্তিকে আইনের আওতায় আনা;

গ. কোনো নারীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারীকে শাস্তির আওতায় আনা;

ঘ. ধর্ষণের ফলে জন্মলাভ করা শিশুর ভরণপোষণের দায়িত্ব ধর্ষণকারীর পরিবর্তে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে নেয়া এবং

ঙ. আদালত কোনো নারীকে নিরাপত্তা হেফাজতে নেয়ার পূর্বে তার সম্মতি নেয়ার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।

৭৩. সরকার দ্রুত এবং স্বল্প খরচে বিচারকার্য সম্পাদন করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বিচারিক কাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে কিছু বিধিবিধান যুক্ত করেছে। এ ধরনের কিছু উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮ এবং অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩-এর মধ্যে বিকল্প দ্বন্দ্ব নিরসন বিধান প্রয়োগ করা।

৭৪. রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও গণতান্ত্রিক করা এবং তাদের আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ (আরপিও)-এ কিছু পরিবর্তন করা হয়। সংশোধিত আরপিও আইন অনুযায়ী, জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা এখন থেকে জনগণের সামনে তাদের সম্পদ ও দায়দেনা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

জেন্ডার গভর্নেন্স

৭৫. সরকার নারী উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নারীর উন্নয়ন বিষয়ক একটি জাতীয় কাউন্সিল কাজ করছে। উন্নয়নে নারী (উইড) ফোকাল পয়েন্ট সব জেলা, উপজেলা উইড সমন্বয় কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি শাসনব্যবস্থায় এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে

একসাথে কাজ করে। জাতীয় বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার লক্ষ্যেও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্থানীয় দরিদ্র নারীদের জন্য উদ্যোক্তা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং পরিবার ও সমাজে নারীর জেন্ডার বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলার সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

সরকারি-বেসরকারি সংগঠন/ব্যক্তিমালিকানা খাতের সমন্বিত উদ্যোগ

৭৬. প্রচলিত শাসন কাঠামো, যা দুর্মোচনীয় এবং কেন্দ্রীভূত উপায়ে কাজ করে, তা থেকে সরে এসে সরকার রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এখন ক্রমবর্ধমান হারে এনজিও/ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের সঙ্গে একত্রে কাজ করছে। সরকারের এই পরিবর্তন সুশীল সমাজ, এনজিও এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন সংগঠনগুলোকে সরকারি কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, নীতিমালার বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ, অ্যাডভোকেসি, আইনের খসড়া প্রণয়ন, নীতিপত্র তৈরি এবং সাধারণভাবে গৃহীতব্য বিভিন্ন উদ্যোগ চিহ্নিত করার কাজে অংশ নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এই প্রবণতা একটি গণতান্ত্রিক এবং সামষ্টিক সামাজিক প্রক্রিয়ার সূচনা করছে। মানবাধিকার ও আইনি ইস্যু ছাড়াও সরকার এনজিওদের সঙ্গে মৌলিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়েও কাজ করেছে। কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, কারিগরি প্রশিক্ষণ, পরিবেশ রক্ষা এবং গ্রামীণ ও কমিউনিটি উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বিত কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ : সরকারি নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি

৭৭. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার পাশাপাশি সমাজে বিদ্যমান সব ধরনের বৈষম্য বিলোপে সরকারের আন্তরিকতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে অথবা বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের উদ্যোগ, নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে।

নারী

৭৮. বাংলাদেশ কোনো সংরক্ষণ ছাড়াই বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন অনুমোদন এবং এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফলোআপ কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও একই বছরে গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আইন, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং পারিবারিক পরিমণ্ডলে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণ। নারী অধিকার আন্দোলনকারীদের অ্যাডভোকেসির প্রেক্ষিতে সরকার ২০০৮ সালে আরেকটি নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে, যা নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

৭৯. দারিদ্র্যের নারীরূপ বিবেচনা করে বিশেষ কর্মসূচি যেমন বিধবা, দুস্থ ও অসহায় নারীদের জন্য ভাতা ব্যবস্থা, দরিদ্র স্তন্যদাত্রী মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ভাতা ও স্থানীয় পুষ্টি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সরকার এসব ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করছে যাতে এর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের আয় এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়।

৮০. নারীর টেকসই উন্নয়ন সাধন করে জেন্ডার সমতা অর্জন নারীর অগ্রগতি ও অধিকার কাঠামো: দারিদ্র্য নিরসনের কৌশল গৃহীত পথপরিক্রমার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এই কাঠামোর কৌশলগত লক্ষ্যগুলোর অন্যতম হচ্ছে নারীর সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি যাতে তারা মূলধারার

বাজারমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং প্রজনন, গৃহস্থালি কাজ ও উপার্জনমুখী কর্মকাণ্ডে নারীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া রাজনৈতিক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারীর অসহায়ত্ব ও ঝুঁকি মোকাবেলায় সামাজিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতীয় জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে গ্রহণযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

৮১. নারী উন্নয়ন বিষয়ক উদ্যোগগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম সফল কর্মসূচি হচ্ছে ভিজিডি। সারাদেশে এই কর্মসূচির উপকারভোগী প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার গ্রামীণ দরিদ্র নারী। ভিজিডি খাদ্য সহায়তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এসব নারী যাতে এনজিওদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সে ব্যাপারে এই কর্মসূচিটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এ উদ্যোগের উপকারভোগী নারী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, খাদ্যশস্য বিতরণসহ অন্যান্য সেবাদান কাজে নিযুক্ত হন এবং মানবাধিকারসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

৮২. সম্পদবঞ্চিত নারী উন্নয়ন প্রকল্প চরম দরিদ্র নারীদের ও তাদের ওপর নির্ভরশীলদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে। ২০০১-০৭ সালে প্রায় ২ লাখ ৭৯ হাজার ৯৯৯ জন ভিজিডি কার্ডধারী নারীকে উপার্জন সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৮৩. বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি কর্মকাণ্ডের একক বৃহত্তম সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ২৮৫৭৩ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের নারীদের সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাক ছাড়াও কাজ করছে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক।

শিশু

৮৪. শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তারা যাতে সুন্দর পরিবেশে নিজেদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে সে জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম শিশুর সুরক্ষা ও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা (সবচেয়ে সাম্প্রতিকটি হলো ২০০৫-১০ সালের) গ্রহণ। জাতীয় কর্মপরিকল্পনার একটি অন্যতম বৃহৎ অর্জন হলো শিশু বিষয়ক কর্মপরিকল্পনাটিকে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভায় শিশুসহ অন্য স্টেকহোল্ডারদের মতামত বিবেচনায় নেয়া। এই প্রক্রিয়াটি শিশুর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন শিশু অধিকার ইস্যুগুলোকে মূলধারার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সন্নিবেশিত করার জন্য অ্যাডভোকেসি ও লবিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৮৫. শিশুদের উন্নয়নে রাষ্ট্রের আন্তরিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে শিশুদের বিষয় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। এছাড়া এতিম ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দুস্থ হয়ে যাওয়া শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে জীবনরক্ষা ভাতা প্রদান করা হয়।

৮৬. শিশুর ওপর যৌন নির্যাতন ও হয়রানি বন্ধ ছাড়াও অনৈতিক কাজে শিশুকে যুক্ত করা এবং তার স্বাধীনতা হরণ করা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করতে সরকার

বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে ২০০২ সালে সরকার শিশুর যৌন নিপীড়ন ও পাচারসহ অন্যান্য অনৈতিক কাজে শিশুদের নিযুক্তকরণের বিরুদ্ধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এর বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

৮৭. সরকার শিশু অধিকার সনদের আলোকে শিশুর আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের পরিচর্যা ও সুরক্ষার জন্য বিকল্প মডেলের জাতীয় সামাজিক নীতির খসড়া প্রণয়ন করেছে। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি শিশুদের আইনি সহায়তা প্রদানের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে।

৮৮. শিশুশ্রম বিলোপের প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে জাতীয় শিশুশ্রম নীতি চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এই লক্ষ্যে সরকার সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম বিলুপ্ত করার একটি নির্ধারিত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনাও প্রণয়ন করেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুশ্রমের মূল কারণ অনুসন্ধানপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ, শিশুর মৌলিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে পরিচালিত কার্যক্রমকে জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাথে সম্পৃক্তকরণ। এই কর্মসূচিটি সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম বিলুপ্তি সংক্রান্ত কনভেনশন অনুমোদনের ফলোআপ কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী

৮৯. জাতি, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি নির্বিশেষে সব জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। একই সাথে আদিবাসীসহ সব সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও তাদের জীবনমান বৃদ্ধির ব্যাপারেও সরকার সমান গুরুত্ব আরোপ করে।

৯০. পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১টি ভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর বসবাস। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্যাঞ্চলের সব জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ অঞ্চলের আদিবাসীদের দ্বারা গঠিত পার্বত্য জেলা পরিষদ মূলত এখানকার সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৯১. পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সাধারণ বরাদ্দের পাশাপাশি বিশেষ উন্নয়ন বাজেটও বরাদ্দ দেয়া হয়, যা ২০০৩-০৪ সালের ১০৯৬২ লাখ ছাড়িয়ে ২০০৭-০৮ সালে ২৫৭৭৩ লাখ টাকায় উন্নীত হয়েছে। এর আওতায় যেসব খাতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হবে তা হলো স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা এবং পানি ও স্যানিটেশন। পার্বত্যাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের জন্য খরা কৃষি মৌসুমে, খাদ্যাভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় টেস্ট রিলিফ (খাদ্যশস্য) এবং Gratuitous Relief (cash) প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

৯২. পার্বত্য জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তিনটি পার্বত্য জেলার প্রতিটিতেই জেলা জজ ও সেশন জজ আদালত গঠন করা হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য জেলাগুলোর প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল টেলিফোন নেটওয়ার্ক চালুর উদ্দেশ্যেও সরকার উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

৯৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন ও এর ঐচ্ছিক প্রটোকলে স্বাক্ষরকারী ৪১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ২০তম। সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার

নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ৪৬টি ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও তাদের আর্থিক সহায়তাসহ অন্যান্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন গঠন করা হয় ১৯৯৯ সালে। সরকার একে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে পুনর্গঠিত করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির আলোকে সম্প্রতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কমিটিতে এই ফাউন্ডেশনের একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন।

৯৪. সরকার দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (PEDP-II) আওতায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণ করেছে, যার ফলে প্রতিবন্ধী শিশুরা ধীরে ধীরে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হতে পারবে। এ বিষয়ে ২০০৬ সালে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা ২০০৮ সালে হালনাগাদ করা হয়। এই পরিকল্পনায় গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বাস্তবায়নরত বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন সহায়ক কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শরণার্থী

৯৫. সরকার মায়ানমার থেকে আগত শরণার্থীদের খাদ্য ও চিকিৎসা সেবাসহ সাময়িক আশ্রয়ের ব্যাপারে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করছে। শরণার্থী শিবিরে তাদের দুর্দশার কথা বিবেচনা করে সরকার সেখানকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিশেষ বিধি চালু করেছে। তাদের আশ্রয়ের জন্য সরকার মোট ৭০৩ একর জমি বরাদ্দ করেছে যার মূল্য প্রায় ৭০ মিলিয়ন টাকা। প্রায় ২০০০ শরণার্থী পরিবার এই আশ্রয় কেন্দ্রে বসবাস করছে।

৯৬. ক্যাম্পের প্রায় ৭৫০০ শরণার্থী শিশুর জন্য ২০টি স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। শরণার্থীদের স্বনির্ভরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মায়ানমারের শরণার্থীদের প্রশাসনিক সহায়তার জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিআর)-র নির্বাহী কমিটি ৫৯তম অধিবেশনে মায়ানমারের শরণার্থী ও আটকে পড়া পাকিস্তানিদের জীবনমান বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা নেয়ায় বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, ১৯৫১ সালের শরণার্থী বিষয়ক কনভেনশনের স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র না হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ হচ্ছে একমাত্র দেশ, যা শরণার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

দারিদ্র্য নিরসন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা এডিপি

৯৭. বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নই মূলত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। নাগরিকদের, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিতদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করাও এডিপির অন্যতম লক্ষ্য।

৯৮. সরকার বেশকিছু দরিদ্র ও নারীবান্ধব উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। স্থানীয় দারিদ্র্য বিমোচন, উৎপাদনমুখী জীবিকা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারী নির্যাতন বন্ধ, সামাজিক

সুবিধাবঞ্চিত নারীর ক্ষমতায়ন, নারী পাচার বন্ধ, সামাজিক ও আইনি বিষয়ে ক্ষমতায়ন, নীতিমালা প্রণয়ন ও পলিসি লিডারশিপ ও অ্যাডভোকেসি, অসহায় নারীদের টেকসই জীবিকা উন্নয়নসহ অন্যান্য কর্মসূচি।

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি)

৯৯. ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জেন্ডার সমতা আনার লক্ষ্য ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে এবং অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও সঠিক পথে রয়েছে। ২০০৫ সালে প্রথম পিআরএসপির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২০০৮ সালে নতুন পিআরএসপি গৃহীত হয়, যার উদ্দেশ্য দরিদ্রদের বিশেষ করে নারীদের সুরক্ষায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত উপার্জন/ভোগ বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও অন্যান্য কর্মসূচিভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা। এতে দরিদ্রদের মানবসম্পদ হিসেবে উন্নয়ন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন ও নিরাপদ পানি, পুষ্টি ও সামাজিক উন্নয়নে তাদের সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১০০. পিআরএসপিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের ও অন্য অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, দুর্নীতি রোধ, ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং খাতভিত্তিক সুশাসন নিশ্চিত করার ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। আর এই কাজে সরকার, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিখাত, এনজিও, স্থানীয় সংগঠন, গণমাধ্যম, শিক্ষাবিদ এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল

১০১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসন কৌশল শীর্ষক একটি ভিশন পেপার প্রণীত হয়। এটি মূলত সুষম উন্নয়নের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত উদ্যোগ এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের প্রতি জোর দেয়। সরকার ইতোমধ্যেই স্বল্পমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র ২৮টি জেলার জন্য ১.৪০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দও রাখা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন

১০২. অপ্রত্যাশিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বিশ্ব খাদ্য সঙ্কটের কারণে বাংলাদেশের জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের লোকের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। এসব দারিদ্র্যপীড়িত লোকের সুরক্ষার জন্য সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুবিধাভোগীর সংখ্যাসহ এর আওতা বৃদ্ধি করে অর্থ সাহায্যের পরিমাণ বর্তমান অর্থবছরে ১৬৯.৩২ বিলিয়ন টাকায় (জিডিপির ২.৮ শতাংশ) উন্নীত করেছে, যা গত বছরের চেয়ে ৪৮ শতাংশ বেশি । গত বছরে এই খাতে টাকা বরাদ্দ ছিল ১১৪.৬৭ বিলিয়ন (জিডিপির ২.১ শতাংশ)।

১০৩. নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় যেসব কর্মসূচি নেয়া হয়েছে তার মধ্যে দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১০০ দিনের কর্মসংস্থান সৃজন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২০ লাখ স্থানীয় দরিদ্র লোকের

কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় সরকার ১৫.৭৮ বিলিয়ন টাকার খাদ্যশস্য বরাদ্দ করেছে যার মধ্য দিয়ে বিশেষ করে ১৪৪ মিলিয়ন কর্মদিবসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার মাধ্যমে ১৫ মিলিয়ন পরিবারে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ২৪.৭৬ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১০৪. গৃহহীনদের আবাসন তহবিলের আওতায় নদীভাঙনের শিকার মানুষের ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় রয়েছে বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী, এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা এবং মৌসুমি বেকারত্ব হ্রাস ভাতা। টেস্ট রিলিফ কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার ব্যক্তিদের খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।

১০৫. সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম গ্রাম কেন্দ্র কর্মসূচি চালু করেছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাষন, পুষ্টি, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।

খাদ্য ও স্বাস্থ্য

১০৬. ২০০০ সালে প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সব পর্যায়ের মানুষের জন্য বৈষম্যহীনভাবে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। রোগ প্রতিরোধ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণও এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য।

১০৭. সরকার মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন করেছে যার লক্ষ্য হচ্ছে, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকল্পে গুণগত মানসম্পন্ন সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এইচআইভি/এইডস রোধ, পুষ্টি সম্প্রসারণ, প্রসূতি, গর্ভবতী ও নববিবাহিত মায়েদের মাতৃদুগ্ধ প্রদানে আচরণগত পরিবর্তন ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি স্বাস্থ্য খাতের দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

১০৮. সরকার ২০০৬ সালে জাতীয় খাদ্যনীতি গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে সবার জন্য টেকসই ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। এর লক্ষ্য হচ্ছে–

ক. নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা;

খ. জনগণের খাদ্যক্রয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও

গ. নারী শিশুসহ সব নাগরিকের জন্য যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিতকরণ।

শিক্ষা

১০৯. ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার স্কুলে ভর্তি, প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তি এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অধিকতর মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত করতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। শিক্ষার অভিগম্যতা বিশেষ করে অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি অর্জিত হয়েছে। এই অর্জনের পেছনে যে নীতিগত পরিবর্তন সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জনসম্পদের টেকসই বরাদ্দ, সরকারি-বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্ব ও দরিদ্র এবং মেয়েশিশুর জন্য ভর্তূকি প্রদান।

১১০. সরকার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (PEDP-II) গ্রহণ করেছে একটি সমন্বিত, সামগ্রিক ও খাতভিত্তিক কৌশল হিসেবে। এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু জনগণের শিক্ষার দাবির প্রেক্ষিতে মূলধারার শিক্ষার পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। দেশের ৬০টি উপজেলার ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রায় পাঁচ লাখ স্কুলবহির্ভূত শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তীব্র খাদ্য ঘাটতিযুক্ত এলাকায় স্কুলে খাওয়ানো কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মানবাধিকার সচেতনতা

১১১. সরকার এই মর্মে নিশ্চিত যে, কার্যকর মানবাধিকার বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এর বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি। অ্যাডভোকেসি ও ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা এবং নারী নির্যাতন থেকে শুরু করে বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যু ও অন্যান্য নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এর মধ্যে অন্যতম।

ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

১১২. স্থানীয় জনগণের অন্যতম আয়ের উৎস হচ্ছে ভূমি। ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করেছে, যাতে কৃষিকাজের জন্য ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভূমির ক্ষয় রোধ ও সরকারি খাস জমির সুরক্ষা করা যায়। সরকার ভূমি দখলকারীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ জমি উদ্ধার করেছে, যা বৈধভাবে পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ভূমি প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারা দেশে নাগরিক সনদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

পরিবেশ ও উন্নয়ন

১১৩. সরকার পরিবেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় রোধের কথা বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সামাজিক বনায়ন ও শহরাঞ্চলে নিরাপদ পানীয় জলের অভিগম্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু সফলতাও অর্জিত হয়েছে। ভূমির ব্যবহার, পরিবেশ, বন ও কৃষি সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালাও সরকার গ্রহণ করেছে।

১১৪. শিল্প ও হাসপাতাল বর্জ্য রোধ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষায় স্থানীয় জনগণের দ্বারা বাস্তবায়নকৃত কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে জীববৈচিত্র্য রক্ষাসহ পরিবেশের বিভিন্ন ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষা চালুর মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতেও সরকার ভূমিকা রাখছে।

১১৫. বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হওয়ার কারণে বাংলাদেশ সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির সাথে মানবাধিকার ইস্যুকেও সম্পৃক্ত করেছে, যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন এবং পরবর্তী সময়ের প্রস্তুতি, মোকাবেলা, ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া এবং ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে দুর্যোগের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। এই কর্মসূচির

আওতায় শিশু, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা মোকাবেলায় বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

মানবাধিকারের কার্যকর বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

১১৬. জনগণের মানবাধিকার ভোগের সুযোগ বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব কারণে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে তার মধ্যে শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ছাড়াও আইন ও অধিকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক অবস্থানে অবস্থানকারী মানুষের জ্ঞানের অভাব অন্যতম। এসব নাগরিক অধিকার যেসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তা অনেক ক্ষেত্রেই আইনের সাথে সম্পর্কিত নয় যেমন- দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

১১৭. দারিদ্র্য হচ্ছে অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নারী ও শিশুসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগণের জন্য একটি প্রতিবন্ধকতা। একটি স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র হিসেবে সম্পদের স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশ মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশ বিশ্বাস করে যে, জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমেই সর্বোত্তম মানবাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব।

১১৮. বাংলাদেশ বহুমাত্রিক পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন যা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বিঘ্নিত করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও বন উজাড়, নদী ও ভূমির ক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য প্রভাবের ফলে যেগুলোর জন্য বাংলাদেশ নিজে খুব সামান্যই দায়ী সেগুলো অযাচিত ও মারাত্মক পরিবেশ ঝুঁকির সৃষ্টি করছে, যার সরাসরি শিকার হচ্ছে সাধারণ জনগণ। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে জনগণ জীবিকার জন্য প্রধানত খাদ্যশস্য ও গবাদিপশু পালনের ওপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে যেসব সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব আশঙ্কা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কৃষি উৎপাদন হ্রাস। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে এবং বিশ্বব্যাপী তীব্রভাবাপন্ন আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশ মারাত্মক পরিবেশ ঝুঁকির সম্মুখীন। নিয়মিত বন্যা এবং অতি সাম্প্রতিক সাইক্লোন-সিডরের ফলে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের ব্যাপক এলাকার ফসলহানি দেশের সামগ্রিক খাদ্য স্বল্পতাকে আরও তীব্রতর করেছে।

১১৯. প্রজনন সক্ষমতার হার হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২১০০ সালের মধ্যে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। আর এ কারণে বাংলাদেশের মূল উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দারিদ্র্য নিরসন। ৬৩ মিলিয়নেরও অধিক লোক এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্বায়নের প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রতিবন্ধকতা। এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক অভিবাসীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে শহরাঞ্চলের দারিদ্র্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্মানজনক কাজের অপ্রতুলতা এবং আশ্রয়ের অভাবও এর জন্য দায়ী। শারীরিক নিরাপত্তাহীনতা ছাড়াও অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য দায়ী দারিদ্র্য, যা জনগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও বাধাস্বরূপ। জাতীয় আয় ও ভোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দরিদ্র জনগণের অংশ বৃদ্ধি তাই দেশের উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

১২০. দারিদ্র্য ও পরিবেশ ছাড়াও বড়মাপের দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রাপ্ত সাফল্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। এ ধরনের দুর্নীতি বাংলাদেশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে ধ্বংস করে ফেলেছে। এই বাস্তবতার কারণেও রাষ্ট্র ও ব্যক্তিখাতের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয় এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার হয়, যা মানবাধিকার ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার আরেক বাধা।

সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কারিগরি সহায়তা

১২১. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রচলিত পুরনো আইনি ব্যবস্থাকে পুনর্মূল্যায়ন করার এবং বাস্তবসম্মত উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, যাতে নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করার জন্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উদ্যোগ নেয়া আবশ্যক। কারণ এগুলোই মূল সমস্যা। তাই দারিদ্র্য নির্মূল ও সামষ্টিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মসূচিগুলোতে সম্পদের সমবণ্টন নিশ্চিত করা দরকার। এটা শুধু দরিদ্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য নয় বরং মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্যও প্রয়োজন। ব্যাপকভিত্তিক কিন্তু পরস্পর আন্তঃসম্পর্কযুক্ত উন্নয়ন উদ্যোগ যেমন কৃষি সংস্কার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ড এবং দরিদ্র জনগণের প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যেও উদ্যোগ নিতে হবে।

১২২. বাংলাদেশ গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জন করেছে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অনেকগুলো পূরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। নাগরিকদের মানবাধিকার পুরোপুরি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষায় সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠি হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন এবং জলবায়ু পরিবর্তন খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ। এছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রতি সময়মতো মনোযোগ দিতে হবে।

১২৩. এখন জরুরি ভিত্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধি, সম্পদ আহরণ, প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ফলে মানবাধিকার এবং উন্নয়ন পরিস্থিতির তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি হবে বলে আশা করা হলেও টেকসই ফলাফলের জন্য যথাযথ কৌশলের বাস্তবায়ন জরুরি। এক্ষেত্রে জনপ্রতিষ্ঠানগুলো এবং সংস্কার আন্দোলনের বৃহত্তর কার্যকারিতার লক্ষ্যে দরিদ্রমুখী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিসেবার জন্য অব্যাহত আর্থিক বরাদ্দ, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এবং পদ্ধতিগত ও দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা অপরিহার্য। উন্নয়ন সহযোগিতা অতীতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

সংযুক্তি

সর্বজনীন পুনর্বীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তাকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোর তালিকা :

১. অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ
২. আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
৩. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
৪. বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)
৫. বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দি এনফোর্সমেন্ট অফ হিউম্যান রাইটস (বিএসইএইচআর)
৬. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
৭. নাগরিক উদ্যোগ
৮. নারীপক্ষ
৯. ন্যাশনাল ফোরাম অফ অর্গানাইজেনস ওয়ার্কিং উইথ দি ডিজএবল্ড (এনএফওডব্লিউডি)
১০. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ (টিআইবি)
১১. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ)
১২. বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)
১৩. অধিকার

ইউপিআর জাতীয় প্রতিবেদন তৈরির সময় আরো কয়েকটি এনজিওকে বিভিন্ন পরামর্শ সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এদের মধ্যে কয়েকটি হলো :

১. সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ
২. বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা

তৃতীয় অধ্যায়

ইউপিআর ফোরাম কর্তৃক প্রেরিত বিকল্প প্রতিবেদন

অনুবাদঃ এটিএম মোরশেদ আলম, আসক

প্রতিবেদন পদ্ধতি

১. ইউপিআর সম্পর্কিত বাংলাদেশের মানবাধিকার ফোরাম (পরবর্তীকালে 'ফোরাম' হিসেবে উল্লিখিত) কর্তৃক এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ইউপিআর-এর অধীনে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ১৭টি মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠন মিলে একত্রে ফোরামটি গঠন করেছে (*ফোরামের সদস্য এবং এই প্রতিবেদন প্রস্তুতে সহায়তাকারী সদস্যদের নাম জানতে দেখুন সংযুক্তি-১*)। প্রতিবেদনটি প্রস্তুতের নিমিত্তে ২০০৮ সালের মার্চ, এপ্রিল এবং আগস্ট মাসে ফোরাম কর্তৃক অনেকগুলো সভা আয়োজন করা হয়। প্রতিবেদন লেখার সময় বিভিন্ন প্রকাশনা, দলিল ও ফোরামের সদস্যদের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়গুলো বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে ফোরামের সদস্যরা ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে জাতীয় মতবিনিময় সভার মাধ্যমে আলোচনাও করেছে। প্রতিবেদনে মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত নির্দেশাবলি অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন এবং এসব আইন বাস্তবে কীভাবে প্রয়োগ হচ্ছে সে বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও মূলত প্রতিবেদন সময়সীমা অনুযায়ি বিগত চার বছরের গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে [অক্টোবর ২০০১ থেকে অক্টোবর ২০০৬ পর্যন্ত বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের সময়কাল, অক্টোবর ২০০৬ থেকে জানুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কাল এবং ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে নতুন উপদেষ্টাদের নিয়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালের ঘটনাবলি উল্লিখিত হয়েছে]।

পটভূমি এবং কাঠামো

মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা

২. **মানবাধিকার সনদ :** বাংলাদেশ সব মৌলিক মানবাধিকার সনদ অনুমোদন করেছে [নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ; বর্ণবৈষম্য বিলোপকারী আন্তর্জাতিক সনদ; নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপকারী আন্তর্জাতিক সনদ; নির্যাতনবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ; শিশু অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ]। তবে অনেক সনদেই কিছু বিধানকে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। শুধু একটি সনদের [নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপকারী আন্তর্জাতিক সনদ] ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যক্তিগত যোগাযোগ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং কোনো সনদের ক্ষেত্রেই সনদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসন্ধান পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। উল্লিখিত মৌলিক আন্তর্জাতিক দলিলগুলোর পাশাপাশি গণহত্যা সংক্রান্ত সনদ, জেনেভা কনভেনশন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক প্রণীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন, সেই সাথে নারীর রাজনৈতিক অধিকার এবং বিবাহের সম্মতি বিষয়ক কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সংক্রান্ত রোম সংবিধি এবং অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারের সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে তবে এখনো অনুমোদন করেনি। যে সনদগুলো বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত স্বাক্ষর করেনি সেগুলো হলো– বলপূর্বক অন্তর্ধান থেকে

সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক ১৯৮৯ সালে প্রণীত আদিবাসী ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত সনদ নং ১৬৯। [*বিস্তারিত দেখুন সংযুক্তি–২*]

৩. **বাংলাদেশের স্বতঃপ্রবৃত্ত অঙ্গীকার :** ২০০৬ সালে মানবাধিকার কাউন্সিলের নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বেশ কিছু অঙ্গীকার করে [*বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সংযুক্তি-৩*]। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো– বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, স্বাক্ষর করেনি এমন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সনদ সম্পূর্ণভাবে অনুসমর্থন করবে, মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ পদ্ধতিসহ অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গেও সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে, বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি বিষয়কে নিশ্চিত করবে, একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করবে এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করবে।

প্রতিবেদন তৈরির সময় পর্যন্ত উপরোক্ত অঙ্গীকারগুলোর খুব অল্পসংখ্যকই রাষ্ট্র পূরণ করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে, নতুন কিছু নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিরও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কমিশনের সত্যিকার কার্যকারিতা সম্পর্কে উদ্বেগ থেকেই গেছে। আন্তর্জাতিক সনদ বা চুক্তিগুলোর প্রতি বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনো কোনো সনদ বা চুক্তি থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করেনি, অথবা দেশীয় আইনে এসব সনদ বা চুক্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এমনকি বিভিন্ন সনদের (সিডও ছাড়া) প্রতিবেদন পদ্ধতিতেও কোনো উন্নতি করতে পারেনি এবং চুক্তি পর্যবেক্ষণ কমিটিগুলোর সুপারিশও অনুসরণ করতে পারেনি। বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন নীতির ক্ষেত্রে যদিও কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে, যেমন– জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জাতীয় খাদ্য নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এসব নীতির বাস্তবায়ন নিয়ে উদ্বেগ রয়েই গেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ জারি করা হয় এবং ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত মানবাধিকার কমিশনের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে উদ্বেগ এখনো বর্তমান আছে। কারণ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনো কমিশনার নিয়োগ দেয়া হয়নি। বর্তমান সরকার বিচার বিভাগকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় আইন প্রণয়ন করলেও সরকারের (আইন মন্ত্রণালয়ের) পরবর্তীকালে গৃহীত পদক্ষেপগুলো উচ্চ আদালতে সাংবিধানিকভাবে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। নিম্ন আদালতের রায়কে প্রভাবিত করার ধারা এখনো অব্যাহত আছে।

রাষ্ট্রীয় আইনের বাধ্যবাধকতা

৪. **সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত অধিকারগুলো :** বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার এক বছরের মাথায় ১৯৭২ সালে সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানে বিস্তৃতভাবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোকে সুরক্ষা দেয়া হয়েছে এবং এসব অধিকার লঙ্ঘিত হলে সুপ্রিম

কোর্টে রিট মামলার মাধ্যমে প্রতিকারের বিধান রাখা হয়েছে। সাংবিধানিক অধিকারগুলোর মধ্যে আছে– আইনের চোখে সমতা, আইনের সমান সুরক্ষার অধিকার, বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-লিঙ্গ অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য না করা, নারী, শিশু ও রাষ্ট্রের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার, আইন অনুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকার, অবৈধ গ্রেফতার ও আটক থেকে মুক্তি লাভের অধিকার, জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ, বিচার ও শাস্তি সম্পর্কে সুরক্ষা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার এবং গৃহ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার অধিকার।

৫. **রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক মূলনীতি :** সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার কিছু মৌলিক মূলনীতিও নির্ধারণ করেছে। এসব মূলনীতিতে রাষ্ট্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা বিধানের অঙ্গীকার করেছে– যথা: জাতীয় জীবনে নারীর অংশগ্রহণ, বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে কাজ, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান প্রদানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এসব মূলনীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয় বলে প্রথাগতভাবে মনে করা হয়; কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বেশ কিছু মামলায় জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এসব মৌলিক মূলনীতির প্রয়োগ করেছে।[১]

৬. উল্লেখ্য, এসব মৌলিক মূলনীতির মধ্যে সংবিধানের মূল 'চার স্তম্ভ' যথা– ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র দীর্ঘদিনের স্বৈরতন্ত্র ও সামরিক শাসনের ফলে যথানিয়মেই ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে গেছে। ১৯৭৪ সালে গণতন্ত্রের নীতিকে পরিবর্তিত করে এক দলের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে সামরিক শাসনামলে ১৯৭৬ সালে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিকে পরিবর্তন করে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' করা হয়। যদিও বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে তবুও ১৯৮২ সালে সামরিক শাসনামলে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়। যার ফলে মৌলিক মূলনীতির পরিবর্তনগুলো আরো সুসংহত হয়।

৭. **আন্তর্জাতিক আইনের বিধানকে দেশীয় আইনে সন্নিবেশ :** আন্তর্জাতিক চুক্তির বিধান দেশে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করতে হলে চুক্তির বিধানগুলো অবশ্যই দেশীয় আইনে সন্নিবেশ করতে হবে।[২] কিন্তু অধিকাংশ আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রেই এই বিধান অনুসরণ করা হয়নি (গণহত্যা সনদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম উল্লেখ্য)। তবে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য মামলায় সংবিধানিক অধিকারগুলোকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিধানাবলিকে বিচার বিভাগীয়ভাবে প্রয়োগ করেছে।

১. দেখুন আই. বার্ন এবং সারা হোসেন, 'ইকোনমিক অ্যান্ড সোস্যাল রাইটস্ কেস ল' অব বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান অ্যান্ড শ্রীলংকা', এম. লংফোর্ড, সোসিও-ইকোনমিক রাইটস, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৯, প্রকাশিতব্য।

২. উদাহরণস্বরূপ, [.....] সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, [.....] এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি (অনুচ্ছেদ ২৫, বাংলাদেশ সংবিধান, ১৯৭২)।

৮. **আইনি কাঠামো :** সংবিধান ঘোষণা করেছে যে, সাংবিধানিক অধিকারের সাথে বিরোধপূর্ণ আইন বাতিল বলে গণ্য হবে; কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের পূর্বে প্রণীত অনেক আইন যা স্পষ্টভাবে বৈষম্যমূলক অথবা সাংবিধানিক অধিকারের সাথে সরাসরি বিরোধপূর্ণ তা এখনো কার্যকর আছে এবং প্রয়োগ হচ্ছে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– লৈঙ্গিক বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইন ১৯৫১, পাসপোর্ট আইন ও বিধিমালা এবং পারিবারিক আইনগুলো যার দ্বারা পরিবারের মধ্যে অধিকারগুলো নির্ধারিত হয়।

৯. সংবিধান প্রণয়নের পর প্রণীত অনেক আইনও ধারাবাহিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনে ভূমিকা রেখেছে; কিন্তু বলাবাহুল্য, এসব আইনের প্রয়োগ এখনো জারি আছে। এসব আইনের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত হলো– বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪। নির্বাচনের সময় স্পষ্ট অঙ্গীকার করলেও কোনো সরকারই এই আইন সংশোধন করেনি। ১৯৯০ সালের পর থেকে প্রত্যেক নির্বাচিত সরকারই সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন করেছে, এই আইনেও রাষ্ট্রকে ক্ষমতা অপব্যবহারের অথবা অবৈধভাবে গ্রেফতারের ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ন্যায়বিচার বিঘ্ন করার সর্বোচ্চ সীমাকেও অতিক্রম করা হয়েছে। অতিসম্প্রতি সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৮-এর মাধ্যমে 'সন্ত্রাসী কার্যক্রম' নামে বেশ কিছু কার্যাবলিকে এই আইনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এই আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হবে 'দ্রুত বিচার ব্যবস্থা'য় এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে এখানে অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

১০. দীর্ঘ প্রত্যাশিত কিছু আইন প্রণয়নে সম্প্রতি কিছুটা অগ্রগতি দেখা যায়, যেমন– প্রস্তাবিত পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, খসড়া তথ্য অধিকার আইন, খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশ, খসড়া ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ আইন এবং নাগরিকত্ব আইন নিয়ে সরকার সচেতন নাগরিক সমাজের সাথে আলোচনা করেছে। আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে মানবাধিকার সংগঠন ও সাংবাদিক মহল এসব আইনের বেশ কিছু বিধান নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করেছে। এসব আইনের খসড়া তৈরিতে নাগরিক সমাজই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, খসড়া আইনগুলো নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেভাবে সাড়া দিয়েছে তাতে মনে হয়েছে নির্বাচনের আগেই তারা এসব খসড়া আইনে পরিণত করবে, অথচ বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলই আইনগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো পরিষ্কার বক্তব্য রাখেনি।

১১. **নীতিগত কাঠামো :** প্রতিবেদন সময়কালে জনগণের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত, সরকার ২০০৬ সালে জাতীয় খাদ্যনীতি (এনএফপি) গ্রহণ করেছে। এই নীতির মাধ্যমে সবার জন্য এবং সবসময়ের জন্য একটা নির্ভরযোগ্য ও স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৩]

১২. মূল জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭-এর মৌলিক পরিবর্তন করা হয় ২০০৪ সালে কঠোর গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে। এই পরিবর্তনের ফলে শুধু নারীর সমান অধিকার এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকেই সীমিত করা হয়নি বরং নারীকে নারী হিসেবে গৃহ ও পরিবারের মধ্যে বিশেষ ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছে। নারী অধিকার কর্মীদের

৩. মোঃ কুরবান আলী, 'রাইট টু ফুড', হিউম্যান রাইটস্ ইন বাংলাদেশ, আসক, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৯২।

দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক অ্যাডভোকেসির ফলে যখন ৮ মার্চ ২০০৮ নতুন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করা হলো তখন কিছু ইসলামি গোষ্ঠী ছাড়া এটাকে অন্যরা ব্যাপকভাবে স্বাগত জানায়। এসব ইসলামি গোষ্ঠী রাজপথে আন্দোলন শুরু করে, নারী অধিকার কর্মীদের ভীতি প্রদর্শন করে এবং সম্পূর্ণ ভ্রান্তভাবে তারা দাবি করে যে, এই নীতির মাধ্যমে সমান উত্তরাধিকারের বিধান রাখা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের বিধানকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। অথচ ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের যে বিধান রাখা হয়েছিল ২০০৮ সালের নীতিতে তা বাদ দেয়া হয়েছে।

মানবাধিকার সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১৩. বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বর্তমান। এখানে প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান এবং প্রেসিডেন্ট হলেন রাষ্ট্রপ্রধান। জাতীয় সংসদ নামে পরিচিত এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠনের জন্য প্রতি ৫ বছর অন্তর ১৮ বছরের ঊর্ধ্বের সব নাগরিকের সরাসরি ভোটের প্রয়োজন হয়। জাতীয় সংসদে ৩০০টি সাধারণ আসনের অতিরিক্ত ৪৫টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। রাজনৈতিক দল বা জোটের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অনুপাত অনুসারে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের নির্বাচন করা হয়।[৪] যদিও সংসদ হলো দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু সংবিধান অনুসারে সংসদ যখন ভেঙে যাওয়া অবস্থায় থাকে অথবা যখন সংসদের অধিবেশন থাকে না তখন প্রেসিডেন্ট অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করতে পারেন। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে শুরু করে এই প্রতিবেদন দাখিল করা পর্যন্ত যেহেতু সংসদ ভেঙে যাওয়া অবস্থায় আছে তাই সব আইনই অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে অনেক আবেদন এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন আছে।

১৪. বিচার বিভাগ বিশেষ করে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্ট সাংবিধানিক এখতিয়ারের আওতায় মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ করার জন্য সংবিধানের মাধ্যমেই দায়িত্বপ্রাপ্ত। মূল সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পরিষ্কারভাবে নিশ্চিত করা হলেও পরে একাধিকবার সংবিধান সংশোধন এবং নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের ফলে ঐতিহ্যগতভাবে বিচার বিভাগের প্রতি যে উচ্চ ধারণা ছিল তা উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষয় হয়েছে। উচ্চ আদালতকে ব্যাপকভাবে দলীয়করণ, বিশেষ করে বিচারকদের নিয়োগ ও তাদের স্থায়ী না করা এবং অবসরগ্রহণের পর তাদেরকে সরকারের উচ্চপর্যায়ের বিভিন্ন পদে পুনর্নিয়োগ প্রদানের ফলে তাদের নিরপেক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে জনগণের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে। জরুরি বিধিমালার অধীনে আইনত ও কার্যত দু'ভাবেই সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও এখতিয়ার অনেকাংশে কর্তনও করা হয়েছে।

৪. যদিও নারী আন্দোলনের একটি অংশ আইনের এই বিধানকে চ্যালেঞ্জ করেছে এই যুক্তিতে যে এই বিধান অসাংবিধানিক এবং পুনরায় লিঙ্গবৈষম্য সৃষ্টি করছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আইনের এই বিধানকে বলবৎ রেখেছে। দেখুন– হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ, আসক, ঢাকা ২০০৪; হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ, আসক, ঢাকা ২০০৫।

১৫. নিম্ন আদালতকে স্বাধীন করতে সংবিধানে যে নির্দেশনা আছে *মাসদার হোসেন বনাম বাংলাদেশ*[৫] মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৯ সালে তাকে কার্যকারিতা দিয়েছে। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ১২ দফা নির্দেশনা দেয়। পরপর দুটি নির্বাচিত সরকার এসব নির্দেশনা পূরণ করতে ব্যর্থ হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করে।[৬] এভাবেই শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট– যারা ফৌজদারি বিচারের মূল দায়িত্বে নিয়োজিত– তাদের নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় নামে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। তবে আমলাতন্ত্রের মধ্যে যাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে তাদের পক্ষ থেকে বিরোধিতাও করা হয়। অতিসম্প্রতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। নিম্ন আদালতের কার্যকর স্বাধীনতা নিয়ে এখনো উদ্বেগ রয়েই গেছে। কারণ এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সম্পদ ও দক্ষতার অভাব আছে। যদিও আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে তবুও নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করার ঘটনা এখনো অব্যাহত আছে। বিচারকদের নিয়োগ ও পোস্টিংসহ অন্য যেসব বিষয়ে এখনো নির্বাহী বিভাগ (বিশেষত আইন মন্ত্রণালয়) দায়িত্ব পালন করছে। অতিসত্বর সেদিকে নজর দেয়া উচিত।

১৬. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৭ প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবেদন দাখিল করা পর্যন্ত মানবাধিকার কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করেনি। কমিশনের বাছাই কমিটিতে নির্বাহী বিভাগের সদস্যদের সংখ্যাধিক্য কমিশনের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন আদালত, ন্যায়পাল বা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার বিষয়বস্তুর তদন্ত এবং কমিশনের সুপারিশ ও নির্দেশনা মেনে চলতে রাষ্ট্রকে বাধ্য করার ক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি কারণে মানবাধিকারের কার্যকর প্রহরী হিসেবে প্রস্তাবিত মানবাধিকার কমিশন কতখানি কার্যকর হবে– সে বিষয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলো ইতোমধ্যেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। সংবিধান এবং আইনের স্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেদন তৈরির সময় পর্যন্ত ন্যায়পালের কার্যালয় স্থাপন করা হয়নি।

১৭. **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী :** পুলিশের ওপর নির্বাহী বিভাগের প্রভাব খাটানো নিয়ে অব্যাহতভাবে চলে আসা উদ্বেগ, সেই সাথে পুলিশের দক্ষতা ও কার্যকারিতার অভাব প্রভৃতি কারণে সরকারের পুলিশ সংস্কার কার্যক্রমের ভিত্তি রচিত হয়েছে (পুলিশ সংস্কার কার্যক্রম যৌথভাবে শুরু করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, ইউএনডিপি এবং ডিএফআইডি)। অপরাধ প্রতিরোধ, তদন্ত, পুলিশের কার্যপদ্ধতি ও ফৌজদারি মামলা পরিচালনা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ নির্দেশনা, কৌশলগত

৫. মাসদার হোসেন, নিম্ন আদালতের একজন বিচারক, সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি দায়ের করেন এই যুক্তিতে যে, বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ হলেন বিচার বিভাগের অংশ। সুতরাং সিভিল সার্ভিস বিধিমালার মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়। হাইকোর্ট বিভাগ মাসদার হোসেনের পক্ষে রায় দেন এবং আপিল বিভাগ সেই রায়কে সমুন্নত রাখেন (সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় বনাম মাসদার হোসেন, (২০০০) বিএলডি (এডি) ১০৪)।

৬. এগুলো হলো– বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন রুলস ২০০৭, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস কনস্টিটিউশন, কম্পোজিশন, রিক্রুটমেন্ট, সাসপেনশন, ডিসমিসাল অ্যান্ড রিমুভ্যাল) রুলস ২০০৭ এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (পোস্টিং, প্রমোশন, লিভ, কন্ট্রোল, ডিসিপ্লিন অ্যান্ড আদার সার্ভিস কন্ডিশন) রুলস্ ২০০৭। ফৌজদারি কার্যবিধির (সংশোধন) অধ্যাদেশ এবং জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন রুলস ২০০২ আগেই গ্রহণ করা হয়।

দক্ষতা ও দূরদৃষ্টিতা ইত্যাদি বিষয়সহ এই কার্যক্রমে জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের পরিবর্তে বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭ নামে একটি খসড়া প্রণয়ন, ঢাকা ও খুলনায় দুটি ফরেনসিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, 'মডেল' থানা প্রতিষ্ঠা, পুলিশ প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্য একটি জেন্ডার নির্দেশাবলি তৈরি ও বিতরণ করা, পুলিশের নারী সদস্যদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার (নির্যাতিতের জন্য সহায়তা কেন্দ্র) স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ পরিলক্ষিত হয়েছে।

মানবাধিকারের সুরক্ষা ও উন্নয়ন

১৮. **জরুরি অবস্থা এবং 'সংস্কার উদ্যোগ':** অনেক নাগরিক, সেই সাথে গণমাধ্যম এবং নাগরিক সংগঠন ১১ জানুয়ারি ২০০৭ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠনকে প্রাথমিকভাবে স্বাগত জানায়। কারণ তারা এটাকে বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে মুক্তি এবং কিছুটা আশার আলো হিসেবে দেখেছিল। প্রধান দুটি রাজনৈতিক জোটের নেতৃত্বে থাকা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও দ্বন্দ্বের ফলে কার্যত দেশে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। শুরু থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘোষণা করে যে, তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হলো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। এই লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যাপকভাবে প্রচারিত দুর্নীতি দমন অভিযান শুরু করে এবং অভিযানে এমন কিছু রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্বকে গ্রেফতার করা হয় যারা পূর্বে ছিল একেবারেই 'ধরা ছোঁয়ার বাইরে'। সেই সাথে সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্যও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম দ্বারা প্রশংসিতও হয়। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মধ্যে ছিল– একটি নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য ও সমন্বিত ভোটার তালিকা তৈরি করা, সরকারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে প্রথমে পুনর্গঠন এবং পরে পুনর্বিন্যাস করা, যে প্রতিষ্ঠানগুলো আইন বা অন্যান্যভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অদক্ষতা ও অযোগ্যতার কারণে ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। প্রতিষ্ঠান তিনটি হলো– নির্বাচন কমিশন (ইসি), পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এবং দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়েও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করা হয়। যেসব কর্মকর্তা দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পেয়েছিলেন কঠোর সমালোচনার মুখে তারা পদত্যাগ করেন। 'দুর্নীতি দমন অভিযানে'র মাধ্যমে ক্ষমতাধর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যারা তাদের সরকারের সময় ছিল সব ধরনের দায়মুক্ত, তাদের গ্রেফতার করা হলেও কৌশলে তারা বের হয়ে আসে। ফলে দুই বছর পর এই নিয়ন্ত্রণহীন ও অকার্যকর 'দুর্নীতি দমন অভিযান' কোনো প্রকার জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি বলেই প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া আরো অনেক বিষয় যেমন– ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং গোয়েন্দা সংস্থার অতি খবরদারির কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভাবমূর্তি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। প্রতিরোধ ও প্রতিকারহীনভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত থাকে এবং পূর্বে ও বর্তমানে সংঘটিত এসব লঙ্ঘনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা কঠিনই থেকে যায়।

১৯. **অব্যাহত দায়মুক্তি :** ১৯৭১ সাল থেকেই বাংলাদেশ দায়মুক্তির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সবচেয়ে ঘৃণ্যতম অপরাধ যেমন গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং আগ্রাসনের মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হলেও এসব অপরাধ এখনো বিচারহীন অবস্থায় আছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জরুরি অবস্থার সময় দায়মুক্তির এই চর্চা আরো খারাপ আকার ধারণ করে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কোনো সমন্বিত পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়নি এবং এমন কোনো আইন প্রণীত হয়নি যে আইনের মাধ্যমে দেশীয় ষড়যন্ত্রকারী এবং সামরিক অপরাধীদের আলাদা করে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সর্বোপরি, সম্পদ ও দক্ষতার অভাব এবং আন্তর্জাতিক চাপের কারণে গ্রহণযোগ্য তদন্ত বা বিচারকাজ আজ পর্যন্ত শুরু করা সম্ভব হয়নি। যার ফলাফল হলো আন্তর্জাতিক এই অপরাধ এখনো দায়মুক্ত অবস্থায় আছে। গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার অভাবে দায়মুক্তি বর্তমানে বিচার বিভাগের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। আইনের তোয়াক্কা না করে এবং পরিস্থিতি বা ফলাফল বিবেচনায় না এনে যারা যখন ক্ষমতায় থেকেছে তারা তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অপব্যবহার করেছে। ভয়ানক অনেক অপরাধের বিচার এখনো হয়নি এবং বিচার বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া দায়মুক্তির অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি এই চর্চার বিরুদ্ধে এবং এযাবৎ 'অধরা' ও 'আইনের ঊর্ধ্বে' থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল সেটাও দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোদুল্যমান।

২০. **জীবন, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার :** জরুরি অবস্থার পূর্বে ও পরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বিচার বিভাগীয় হত্যাকাণ্ড, হেফাজতে মৃত্যু এবং ধর্ষণসহ অন্যান্য নির্যাতন অব্যাহত আছে। এসব অপরাধের বিরুদ্ধে কোনোরূপ সরকারি তদন্ত হয়নি। দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় নাগরিকদের জীবনের অধিকারকে আরো ঝুঁকির মধ্যে *ঠেলে দেয়া হয়েছে* [*পরিসংখ্যানের জন্য দেখুন সংযুক্তি–৪*]। এরূপ হত্যাকাণ্ডের দায়ে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত, বিচার বা শাস্তি প্রদান সম্পর্কিত আদৌ কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় কিনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়।

২১. ধর্মীয় চরমপন্থিদের হিংস্র আক্রমণ মানুষের জীবন, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকারকে অনেকাংশেই খর্ব করেছে। তারা বেশ কয়েক বছর ধরে স্বীকৃতভাবেই দায়মুক্তি পেয়ে আসছে। প্রতিবেদন সময়কালের মধ্যে আদালত প্রাঙ্গণ, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সভা, সিনেমা হল, ধর্মীয় উপাসনালয় এবং দলীয় সভাতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটাতে দেখা গেছে। ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য মোট ২৭টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে এবং এসব ঘটনায় ১৭১ জনের প্রাণহানি ঘটেছে ও ১,৭৭৩ জন আহত হয়েছে। জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ-এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এসব ঘটনার দায়ে বিচার করা হয়েছে এবং তাদের স্বীকারোক্তির ওপর ভিত্তি করে শাস্তিও প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অতিদ্রুততার সাথে তাদের শাস্তি কার্যকর করা এবং ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়ে জনসমক্ষে তাদের কথা বলতে না দেয়ার কারণে বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যাদের ইন্ধনে এসব ঘটনা ঘটেছে তারা অপ্রকাশিত থাকায় আইনের উর্ধ্বে থেকে সুদীর্ঘ সময় তারা এরূপ ঘটনা আরো ঘটাবে বলেও জনমনে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

২২. উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিক ও শিক্ষকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের আততায়ীর হাতে নিহত হওয়া এবং দায়ী ব্যক্তিদের আইনের সামনে আনতে বিলম্ব হওয়ার ঘটনা অব্যাহত আছে (উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো হলো– ১৯৭৫ সালের আগস্টে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান এবং তার পরিবারের সদস্যদের সপরিবারে হত্যা, ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও অন্য তিনজন মন্ত্রীকে হত্যা, গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়াকে হত্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাহেরকে হত্যা এবং বিবিসির সাংবাদিক মানিক সাহাকে হত্যা)। দায়মুক্তির মূল সমাজের কত গভীরে এবং কত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেছে এগুলো হলো তার উদাহরণ, যা ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে দোষী ব্যক্তিদের তদন্ত, বিচার এবং শাস্তিদানে ব্যর্থতার কারণে বারবার নিয়মিতভাবে ফিরে এসেছে।

২৩. প্রতিবেদন সময়ে অবৈধ গ্রেফতার, আটক এবং 'গণগ্রেফতার'-এর ঘটনা অব্যাহতভাবে ঘটেছে। জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার অধীনে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার এমনকি শুধু 'আইনবহির্ভূত' কার্যক্রম ঘটাতে পারে এই সন্দেহে গ্রেফতারসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গ্রেফতারের ক্ষমতা এবং জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার অধীনে কোনো অপরাধে গ্রেফতারকৃতদের জামিনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। এর প্রভাব অনানুপাতিক হারে পড়েছে দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর। কারণ তারা উচ্চ আদালতের বনেদি পদ্ধতির কাছ থেকে কোনো প্রতিকার পেতে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতারকৃত ভিআইপিদের তুলনায় অসমর্থ। আসক-এর তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের হিসাব মতে, ২০০৬ সালে ৪৭ হাজার ২৩৫ জন গণগ্রেফতারের শিকার হয়েছে এবং শুধু ২৬ মে ২০০৮ থেকে ১৭ জুন ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে যৌথবাহিনী গ্রেফতার করেছে প্রায় ২৩ হাজার ৯৪৯ ব্যক্তিকে।

২৪. **মত প্রকাশের স্বাধীনতা :** সাংবাদিকদের দমন ও হয়রানির নীতি রাষ্ট্রীয় এবং অরাষ্ট্রীয় উভয় পক্ষ থেকেই সাধারণভাবে জারি ছিল। সাংবাদিক হয়রানির ধরনে যে পরিবর্তন হয়েছে তা প্রতিবেদন সময়ে সহজেই অনুধাবন করা যায়। বিএনপির নেতৃত্বে জোট সরকারের সময় সাংবাদিক নির্যাতন আইনি ও আইনবহির্ভূত দু'ভাবেই ঘটতে দেখা গেছে। রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহার অথবা ক্ষমতাবান অর্থনৈতিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য যেসব সাংবাদিক সুপরিচিত ছিলেন তাদের অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের দ্বারা খুন হতেও দেখা গেছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে আলোড়িত ঘটনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ১৫ জানুয়ারি ২০০৪ বিবিসির সাংবাদিক মানিক সাহাকে হত্যা এবং ২০০৪ সালে হুমায়ুন কবির বালুকে হত্যা। এ হত্যা মামলা এখনো বিচারাধীন আছে। অন্যদিকে ২০০৫-২০০৬ সালে অনেক সাংবাদিককে ফৌজদারি মানহানি মামলার সম্মুখীন হতে দেখা গেছে।

২৫. মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করতে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালায় বিস্তৃত বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদিও নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল যে, এসব বিধান প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু সূত্রমতে তারা সংবাদমাধ্যমগুলোকে এমন এক হুমকির মধ্যে রেখেছিল যে, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমগুলো নিজেরাই সংবাদ কাটছাঁট

করে প্রচার করেছে। জরুরি ক্ষমতা বিধিমালাতে এমন বিধানও ছিল যার ব্যবহার করে কোনো সংবাদকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়া বা কোনো সংবাদমাধ্যম অধিগ্রহণ করা সম্ভব। ২০০৬ সালের বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন (সংশোধন) আইনেও এ ধরনের বিধান পরিলক্ষিত হয়।

২৬. কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়া ২০০৭ সালে অনেক সাংবাদিককে গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার হতে দেখা গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– ঢাকার ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক তাসনিম খলিল এবং রাজশাহীর সাংবাদিক জাহাঙ্গীর আলম আকাশ। সংবাদপত্রে একটি কার্টুন ছাপানোর কারণে সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতিপত্র বাতিলের হুমকি ছিল জরুরি অবস্থার সময় সংবাদমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণের একটা জাজ্বল্যমান উদাহরণ। পরে ওই পত্রিকার প্রকাশক জনসমক্ষে ইসলামি গোষ্ঠীর কাছে ক্ষমা চেয়ে উতরে যান। ইসলামি গোষ্ঠীর রাজপথে বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে কার্টুনটি আঁকার দায়ে ২৩ বছর বয়সী সাংবাদিক আরিফুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭ এবং প্রায় ছয় মাস জেল খাটার পর তিনি মুক্তি পান।

২৭. জরুরি অবস্থার পূর্বে ও পরে সাংবাদিকদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও সন্ত্রাসীসহ বিভিন্ন মহল কর্তৃক ২০০৫ সালে চারজন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়, ১৬৩ জনকে হত্যার হুমকি দেয়া হয় এবং ২১৪ জনকে হুমকি বা হয়রানি বা আক্রমণ করা হয়। ২০০৬ সালেও চারজন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়, ৪৮ জনকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়, দু'জনকে অপহরণের চেষ্টা করা হয় এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ৮০ জনকে ও সন্ত্রাসী কর্তৃক ৯৭ জন হুমকি/হয়রানির শিকার হন। ২০০৭ সালে তিনজন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়, ৫৬ জনকে হত্যার হুমকি দেয়া হয় এবং ২৩৯ জন সাংবাদিক হয়রানির শিকার হন। ২০০৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত প্রকাশিত খবরে আটজন সাংবাদিককে হত্যার হুমকি দেয়া হয় এবং ৪৭ জন হয়রানির শিকার হন।

২৮. জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বেতার (রেডিও) ও দূরদর্শনের (টেলিভিশন) স্বায়ত্তশাসন কোনো সরকারই নিশ্চিত করেনি। তবে ২০০৭ সাল পর্যন্ত অনেক বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্র চালু হয়েছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দিতে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানও মানা হয়নি এবং পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে, ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদেরই এসব অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অর্থের উৎস সীমিত করার কারণে (আজকের কাগজ) অথবা অন্যান্য কারণে (সিএসবি নিউজ) এই সময়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বন্ধও হয়েছে অথবা এসবের মালিকানা হস্তান্তরিত হয়েছে।

২৯. **সংগঠন ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা :** জরুরি অবস্থার পূর্বে ও জরুরি অবস্থার সময় বিএনপির নেতৃত্বে জোট সরকার এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার উভয়কেই বিরোধী দলের বিক্ষোভ ও সমাবেশকে প্রতিহত করার মাধ্যম হিসাবে 'গণগ্রেফতার'কে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। ২০০৫ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে চৌদ্দদলীয় জোট 'লংমার্চ' বা 'ঢাকা ঘেরাও' কর্মসূচি দিলে পুলিশ শত শত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। দলীয় কর্মীরা যেমন এই গ্রেফতারের শিকার হয়েছে তেমনি সাধারণ মানুষও গ্রেফতার থেকে বাদ যায়নি। সমাবেশের স্বাধীনতা বা জনবিক্ষোভ ঠেকানোর জন্য পুলিশ আরেকটি পদ্ধতিরও আশ্রয়

নেয়, সেটা হলো– পূর্বে দায়েরকৃত যেসব মামলায় 'অজ্ঞাত আসামি' থাকে সেসব মামলায় এসব মানুষকে গ্রেফতার দেখানো হয়। এই চর্চা পূর্ববর্তী সরকারের সময়ও দেখা গেছে আবার বর্তমান সরকারের সময়ও (২০০৭ সালে) বহুলভাবে এটা চর্চা করতে দেখা গেছে।

৩০. রাজনৈতিক দলের সদস্য ছাড়াও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছে বকেয়া বেতনের দাবিতে এবং পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী শ্রমিক এবং সেই সাথে সারের দাবিতে আন্দোলনকারী কৃষকরা। অন্যদিকে ২০০৭ সালে জরুরি বিধিমালা ভঙ্গ করে একটি ইসলামি গোষ্ঠী– হিজবুত তাহরির সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক এবং তীব্র বিরাগভাজন স্লোগান দিলেও অথবা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বিরোধিতা করে রাজপথে বিক্ষোভ করলেও তাদের কোনোরূপ বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। অন্য একটি ইসলামি দল– জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রেও একই রকম আচরণ পরিলক্ষিত হয় ২০০৮ সালে, যখন দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার তাদের নেতার মুক্তির দাবিতে মিছিল করা হয়। ঐ নেতা অবশ্য পরে মুক্তি পান।

৩১. অনেক স্বনামধন্য এনজিওকে (যেমন- প্রশিকা, প্রিপট্রাস্ট, বিএনপিএস) তাদের অর্থ ছাড় দিতে অস্বীকার করার মাধ্যমে অথবা তাদের ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে দীর্ঘদিন মামলার ফেরে আটকে রেখে তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা প্রদানের মাধ্যমে বিগত সরকারের সময় সংগঠনের স্বাধীনতা প্রায়শই সীমিত করা হয়েছে। জরুরি বিধির অধীনেও অনেক এনজিওর ওপর হুমকি অব্যাহত ছিল। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবৈধ গ্রেফতার ও আটক বা গ্রেফতারের হুমকি দিয়ে অনেক এনজিওর ক্ষেত্রে সরাসরি হস্তক্ষেপও পরিলক্ষিত হয়। জরুরি বিধিমালার প্রত্যক্ষ বিধানও সারা দেশে রাজনৈতিক কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করেছে। এই বিধিতে অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, বেশিরভাগই দুর্নীতির অভিযোগে।

৩২. **খাদ্যের অধিকার :** পরপর দুটি ভয়াবহ বন্যা এবং ২০০৭ সালে সাইক্লোন সিডরের আঘাতে দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের খাদ্যশস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এরই সূত্র ধরে খাদ্যদ্রব্যের আকাল এবং পরবর্তীকালে খাদ্যসামগ্রীর লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি দেশের অধিকাংশ মানুষের ওপর এক অসহনীয় বোঝা চাপিয়ে দেয়। বর্তমান সরকারের কিছু কার্যক্রম যেমন– কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হিসেবে প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু দুর্নীতি দমন অভিযান সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের সীমাহীন দুর্নীতি এসব কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মঙ্গা (ঋতুভিত্তিক খাদ্য সঙ্কট) মোকাবেলায় কোনো দীর্ঘমেয়াদি বা মধ্যমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করা হয়নি। খাদ্যের নিরাপত্তা ও ভেজাল প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের দুর্বল প্রয়োগও একটা উদ্বেগের বিষয় ছিল সবসময়ই।

৩৩. **বাসস্থানের অধিকার :** জোরপূর্বক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও এবং পূর্বে নোটিশ প্রদান ও বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়া উচ্ছেদ না করতে হাইকোর্টের রায়ে সরকারের প্রতি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবছরই বস্তি উচ্ছেদের ঘটনা ঘটে চলেছে। আসক-এর তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের হিসাব অনুসারে, ২০০৩ থেকে ২০০৬ সময়কালের মধ্যে ১৭টি বস্তির ১৪ হাজার ৩৩৩

পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। জরুরি অবস্থা জারির ঠিক পরপরই ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২১টি বস্তি থেকে ৮ হাজার ৮৯০টি পরিবারকে উচ্ছেদ করে গৃহহীন করা হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন ও গণমাধ্যমগুলো এসব উচ্ছেদের বিরোধিতা করেছে এবং তাদের ধারাবাহিক অ্যাডভোকেসির ফলে সরকার একটি উচ্চ পর্যায়ের বস্তি পুনর্বাসন কমিটি গঠন করে। এই কমিটি বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি খুঁজে বের করবে এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কমিটির কার্যক্ষেত্র খুবই সীমিত এবং প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তারা সামান্যই অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে। এই পুনর্বাসন পরিকল্পনা বর্তমানে কার্যকরভাবে মনিটরও করা হচ্ছে না। যার ফলে বস্তিতে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের লোকদের পুনর্বাসন এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে হলেও একটা ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে যে, হয়তো প্রকল্পের সুবিধা বস্তিবাসীদের ভাগ্যে না জুটে অন্যরা ভোগ করতে পারে।

৩৪. **জীবিকার অধিকার :** বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পাইকারিভাবে ফুটপাত ও রাস্তার পাশ থেকে হকারদের উচ্ছেদ করেছে, বিশেষ করে ২০০৭ সালের শুরুর দিকে। যদিও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১১ অক্টোবর ২০০৭ একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে ঢাকা শহরের ২০টি স্থানকে উচ্ছেদকৃত হকারদের জন্য হলিডে মার্কেট (ছুটির দিনের বাজার) হিসেবে ঘোষণা করে; কিন্তু বাস্তবতা হলো বিকল্প পুনর্বাসনের জন্য কোনো নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি।

৩৫. **নারীর অধিকার :** উত্তরাধিকার, বিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, শিশুর হেফাজত এবং দত্তক গ্রহণ বিষয়ে পারিবারিক আইনের প্রাধান্য থাকায় নারীরা প্রতিনিয়তই পরিবারের মধ্যে তাদের অধিকার প্রয়োগে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। নাগরিকত্ব আইনেও নারীর প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থান এবং সম্পদ ও সেবা, বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে কার্যত বৈষম্য বিদ্যমান তা নারীর অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে আরো অধিকতর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করছে। নারীরা গণজীবন ও পারিবারিক জীবন (ঘরে ও বাইরে) উভয় ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার। ঘরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রে প্রাত্যহিকভাবে সহিংসতার শিকার হওয়া বাংলাদেশি নারীদের জন্য ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। নিম্নে যে পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে তা শুধু সেসব ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যৌন হয়রানি, ধর্ষণ এবং পারিবারিক নির্যাতনের প্রকৃত সংখ্যা সন্দেহাতীতভাবে আরো অনেক বেশি, কোনোমতেই কম হবে না। কারণ ভীতি প্রদর্শনের যে সংস্কৃতি সমাজে বিস্তৃতভাবে চালু আছে তা ঘটনার প্রকাশকে নিশ্চিতভাবে বাধাগ্রস্ত করে। অধিকন্তু যেসব ঘটনায় 'সতীত্ব বা যৌন সততা' নষ্ট হওয়ার বিষয় থাকে, সেসব ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে কলঙ্কিত হওয়ার ভয় জনসমক্ষে ঘটনাটি প্রকাশ করতে নিরুৎসাহিত করে [*নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সংক্রান্ত তুলনামূলক পরিসংখ্যানের জন্য দেখুন সংযুক্তি–৪.১*]।

৩৬. প্রতিবেদন সময়কালে সরকার নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন প্রণয়নের জন্য আলোচনা, জেন্ডার সম্পর্কিত পিআরএসপি নির্দেশনা পুনর্বিবেচনা এবং সংশোধিত

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করা। তবে নারী নির্যাতনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে যেসব ব্যক্তি দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর তদন্ত, বিচার এবং শাস্তি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়া নিয়ে উদ্বেগ রয়েই গেছে, বিশেষ করে কর্তৃত্ববহির্ভূতভাবে ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং 'ফতোয়ার' নামে অবৈধ শাস্তি কার্যকর করা।

৩৭. **শিশু অধিকার :** শিশু অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রতিবন্ধতা এখনো বিদ্যমান। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো শিশু শ্রমিকের ব্যাপকতা। প্রচলিত বিভিন্ন আইনে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সের শিশুদের শিশুশ্রমিক হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বলাবাহুল্য এসব আইনের কার্যকর কোনো প্রয়োগ নেই। বাস্তব অবস্থা হলো বাংলাদেশের মোট শিশুর প্রতি আটজনে একজন হলো শিশুশ্রমিক।[৭] বস্তি ও পাহাড়ি এলাকায় প্রায় এক-পঞ্চমাংশ শিশু নিজেদের এবং পরিবারের জীবিকার জন্য শিশুশ্রমে নিয়োজিত। শিশুশ্রমিকদের এক-চতুর্থাংশ স্কুলে যায় না।[৮] বিদ্যমান হিসাব অনুসারে প্রায় ১ লাখ ৪৯ হাজার শিশু পাঁচ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। এগুলো হলো– ঝালাই (ওয়েলডিং), মোটর কারখানায় কাজ (অটো ওয়ার্কশপ), পরিবহন খাত (রোড ট্রান্সপোর্ট), ব্যাটারি রিচার্জ এবং পুনর্ব্যবহার উপযোগী (রিসাইকেলিং) করা। দেশের শ্রমশক্তিতে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রায় ৬৬ লাখ শিশু নিয়োজিত।[৯]

৩৮. **কারাবন্দিদের অধিকার :** যদিও আইনে বিস্তারিত রক্ষাকবজ আছে তবুও বাস্তবে কারাবন্দিদের অধিকারকেই সবচেয়ে বেশি অগ্রাহ্য করা হয়। পর্যাপ্ত আলো-বাতাস বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দিকে অত্যন্ত অনিরাপদভাবে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। সূত্রমতে, ২০০৬ সালের নভেম্বরে দেশে কারাবন্দির মোট সংখ্যা ছিল ৬৬ হাজার ৭৭৮ জন যা ধারণ ক্ষমতার প্রায় আড়াইগুণ বেশি। এদের মধ্যে নারী বন্দির সংখ্যা ছিল ২ হাজার ২১৯ যেখানে নারী বন্দির ধারণ ক্ষমতা ১ হাজার ১৩১।[১০] শিশুদের জেলে আটক রাখার ঘটনা প্রতিনিয়তই প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সাথে বিদেশি বন্দিদের, এমনকি তাদের সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর জেলে আটক রাখা হচ্ছে। আবার মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদেরও দীর্ঘদিন যাবৎ জেলখানায় বন্দি করে রাখার ঘটনা নিয়মিতভাবেই প্রকাশিত হচ্ছে। বিচারাধীন বন্দিরাও পর্যাপ্ত আইনি সহায়তার সুযোগ পাচ্ছে না। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বারংবার নির্দেশনা দিলেও এসব বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে খুব সামান্যই পদক্ষেপ গৃহীত হতে দেখা গেছে।

৩৯. **শ্রমিকের অধিকার :** শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে নতুন শ্রম আইন ২০০৬ সহ অন্যান্য আইন এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও আইনের দুর্বল প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে নিয়মিতই তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) খাতের শ্রমিক অথবা যারা গৃহশ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত তাদের বর্তমান শ্রম আইনের আওতাতেই আনা হয়নি।

৭. ইউনিসেফ, ২০০৭।

৮. ইউনিসেফ, ২০০৭।

৯. দি গ্লোবাল মার্চ এগেন্স্ট চাইল্ড লেবার, ২০০৭।

১০. আসক, হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ ২০০৫, আসক, ঢাকা ২০০৬।

৪০. শিল্পখাতে সাধারণভাবে শ্রমিকদের যেসব অধিকার লঙ্ঘিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– শ্রমিকদের নিয়োগপত্র না দেয়া, পাওনা মজুরি প্রদানে বিলম্ব করা, অতিরিক্ত কর্মসময়ের জন্য মজুরি দিতে ব্যর্থতা, মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদানে ব্যর্থতা এবং শিশু প্রতিপালনের সুযোগ-সুবিধা দিতে ব্যর্থতা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিয়োগকর্তার অবহেলার কারণে কর্মক্ষেত্রে অসংখ্য শ্রমিক আহত এবং নিহত হয়েছে। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা যেগুলোতে এখনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ৭ জানুয়ারি ২০০৫ নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে অবস্থিত শান নিটিং অ্যান্ড প্রসেসিং লিমিটেডের কারখানায় আগুন লেগে ২৩ শ্রমিক আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করে;[১১] ১১ এপ্রিল ২০০৫ সাভারের পলাশবাড়ীতে অবস্থিত স্পেকট্রাম সোয়েটার ইন্ডাস্ট্রিজ ধসে পড়ে ৬৪ জন শ্রমিক মারা যায় এবং প্রায় ৮০ জন আহত হয়[১২] এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ চট্টগ্রামের কেটিএস গার্মেন্টসে আগুন লেগে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায় ৬৫ শ্রমিক এবং আহত হয় ১৫০ জনেরও বেশি শ্রমিক।[১৩] [*সংযুক্তি ৪.২, কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু সংক্রান্ত পরিসংখ্যান*]

৪১. শ্রমিকদের সংগঠন ও সমাবেশের অধিকার নিয়মিতই বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক শ্রমিকদের আন্দোলনে বাধা প্রদান ও আক্রমণ করাও কোনো অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না। জরুরি বিধিমালার স্পষ্ট বিধান হলো জনসমক্ষে সভা, সমাবেশ এবং কোনো ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না। এই বিধান শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়নে বিদ্যমান দমনমূলক পরিবেশকে আরো খারাপের দিকে ঠেলে দেয়। এই কারণে, ২০ মে ২০০৭ গাজীপুরের ফরচুনা অ্যাপ্যারেলস লিমিটেডের শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতন ও অতিরিক্ত কাজের জন্য বকেয়া মজুরির দাবিতে কারখানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিশ এই বিক্ষোভকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এবং ২৫ বছর বয়সী পটুয়াখালী জেলার আসমা আক্তার নামে একজন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।[১৪] ৯ আগস্ট ২০০৭ চট্টগ্রামের আমিন জুট মিলের শ্রমিকরা তাদের বকেয়া পাওনার দাবিতে বিক্ষোভ করলে পুলিশ ৬০০ শ্রমিকের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং সূত্রমতে এই ঘটনায় ১৮ জন শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়, যাদের মধ্যে পাঁচজন আহত শ্রমিকও ছিল। আহতদের মধ্যে অনেকে গ্রেফতারের ভয়ে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[১৫]

৪২. বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের শর্তানুসারে সরকার শিল্পকারখানাগুলোকে সংকোচন বা বেসরকারিকরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যার অংশ হিসেবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অনেক পাটকল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ২০০২ সালে আদমজী পাটকল বন্ধ করে প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। ২০০৭ সালে খুলনা এলাকার চারটি পাটকল বন্ধ করা হয়, যার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক তাদের চাকরি হারায়। ব্যয় সংকোচনের এই নীতিতে যেসব শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে তাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। এমনও উদাহরণ আছে যে, ছাঁটাইকৃত শ্রমিকরা তাদের বকেয়া পাওয়ার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন

১১. প্রাগুক্ত

১২. প্রাগুক্ত

১৩. আসক, হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ ২০০৬, আসক, ঢাকা ২০০৭।

১৪. আসক, হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ ২০০৭, www.askbd.org।

১৫. প্রাগুক্ত।

করেছে এবং সেই বিক্ষোভে পুলিশ নির্মম সহিংসতা চালিয়েছে। তাদের পুনর্বাসিত করা অথবা অন্য কোনোখানে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

৪৩. বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিক, যারা বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১৩টি দেশ এবং ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে, তারা বিভিন্নভাবে অধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে। দেশত্যাগের আগে স্থানীয় রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বিমানভাড়া, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ভিসা ফি এবং অন্য ফি বাবদ অভিবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে এবং বিদেশে তাদের চাকরির শর্ত সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রদান করতে অস্বীকার করছে। যে দেশে তারা যাচ্ছে সেখানেও তারা কম মজুরি পাচ্ছে, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কর্মঘণ্টার চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছে এবং নিম্নমানের জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। কখনো কখনো তারা যৌন হয়রানিসহ অন্যান্য নির্যাতনেরও শিকার হচ্ছে। তাদের স্বাধীনভাবে চলাচলেও বাধা প্রদান করা হচ্ছে। এমনকি নিয়োগকারী সংস্থা কখনো কখনো তাদের পাসপোর্টও নিয়ে নিচ্ছে। অবৈধ শ্রমিকরা বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে এই কারণে যে তাদের যে কোনো সময় ফেরত পাঠানো হতে পারে।

৪৪. অতিসম্প্রতি বাংলাদেশের সাথে নিয়োগকারী দেশগুলোর দ্বিপক্ষীয় চুক্তি অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য কিছুটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। বিদ্যমান আইন, যেমন– ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অধ্যাদেশ এবং এই আইনের অধীনে ২০০২ সালে প্রণীত বিধিমালা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। শ্রমিকদের অধিকারের কথা বিবেচনায় এনে এসব আইনকে আরো পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন করা প্রয়োজন। অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় নিয়োজিত বিদ্যমান ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান যেমন– প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অথবা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (রিক্রুটিং এজেন্টেদের নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশে শ্রমিকদের পাঠানোর বিষয়টি এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীন) তাদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল। এজন্য রিক্রুটিং এজেন্টগুলো আইন লঙ্ঘন করলে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করলেও তাদের জবাবদিহিতা নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের বিদেশি মিশনগুলোর কর্মকর্তাদেরও দক্ষতা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে এবং অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় তারা চরমভাবে অসমর্থ।

৪৫. **ভাষার কারণে বৈষম্য :** উর্দু ভাষায় কথা বলে এমন একটি গোষ্ঠী গত প্রায় ছয় দশক ধরে বাংলাদেশের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে বাস করছে। তারা অবিচলভাবে তাদের নাগরিকত্ব দাবি করে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের একটি যুগান্তকরী রায়ের মাধ্যমে তারা ভোটার তালিকায় বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করাতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু এই ভোটাধিকার ও নাগরিকত্বের ফলে তাদের ওপর নতুন কিছু অসুবিধা আরোপ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে তারা যে ক্যাম্পে রাষ্ট্রহীন মানুষ হিসেবে এ যাবৎ বাস করে আসছিল, সেখান থেকে উচ্ছেদ করার হুমকি দেয়া হচ্ছে। অবৈধ সম্পত্তি বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্প্রতি যে পদক্ষেপের সূচনা করেছে তা সারা দেশের কিছু 'বিহারি' সম্প্রদায়, যারা ইতোমধ্যে এই ঘটনার চাপ অনুভব করেছে, তাদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে, সম্পূর্ণ সম্মানের সাথে একীভূত হওয়া নিয়ে নতুন

কিছু শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা সেবা, সেই সাথে ভাষা সংক্রান্ত অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই সম্প্রদায় বৈষম্যের শিকার।

৪৬. **বর্ণ বা নৃতাত্ত্বিক কারণে বৈষম্য :** আনুমানিক প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লাখ[১৬] আদিবাসী, যারা সাধারণভাবে 'আদিবাসী' (সমতল এলাকায়) এবং 'পাহাড়ি' (পার্বত্য চট্টগ্রামে) নামে পরিচিত, তারা মিলে বাংলাদেশে প্রায় ৪৫ ধরনের নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত সম্প্রদায় তৈরি করেছে। এই সম্প্রদায়গুলো ধারাবাহিকভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, বিশেষ করে উন্নয়নের নামে (ইকোপার্ক, বৃক্ষরোপণ, অবকাঠামো নির্মাণ) তাদের জমি অবৈধভাবে দখল এবং ভূমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বিচার প্রাপ্তি ও আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রেও তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

৪৭. সাম্প্রতিক সময়ে সমতল ভূমির আদিবাসীদের জমি দখলের উদাহরণের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, ২০০৬ সালের এপ্রিলে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার দক্ষিণ শাহবাজপুর ইউনিয়নের ১০টি খাসিয়া পরিবারকে স্থানীয় চা বাগান কর্তৃপক্ষ মিথ্যা দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। এর ফলে তারা তাদের ঘরবাড়ি ও পানের বরজ থেকে বঞ্চিত হয়। অন্য একটি ঘটনায়, ২০০৭ সালের নভেম্বরে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার দিবার ইউনিয়নের কাজীপাড়া গ্রামের প্রায় ৫০টি ওঁরাও পরিবার স্থানীয় বাঙালিদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়। এই ঘটনায় ১৭টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয় এবং নারীসহ ১৫ জন ওঁরাও আহত হয়। অতিসম্প্রতি ২০০৮ সালের এপ্রিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় পাহাড়ি সম্প্রদায়ের অনেক বাড়ি পুড়ে মাটিতে মিশে যায়। এসব ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে আজ পর্যন্ত কোনো সরকারি তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি, ক্ষতিগ্রস্তদের কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণও প্রদান করা হয়নি।

৪৮. ভূমি জবরদখলের প্রতিবাদ যারা করেছে, অনেক ক্ষেত্রে তাদের গ্রেফতার, নির্যাতন এমনকি হত্যার শিকার হতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ– রাং লাই ম্রোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাং লাই ম্রো স্থানীয় সরকারের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং ম্রো সম্প্রদায়ের নেতা, সেই সাথে তিনি একজন মানবাধিকার কর্মীও বটে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলা থেকে তাকে একটি সাজানো ফৌজদারি মামলার আসামি দেখিয়ে গ্রেফতার করা হয় এবং নির্মমভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। এ বিষয়ে তিনি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্যোগ নিলে তাকে সাজা প্রদান করা হয়। এর পূর্বে ইকোপার্ক স্থাপনের প্রতিবাদ করায় গারো সম্প্রদায়ের পিরেন স্নালকে ৩ জানুয়ারি ২০০৪ পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। এই ঘটনায় আজ পর্যন্ত কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অতিসম্প্রতি গারো সম্প্রদায়ের নেতা চলেশ রিচিল যৌথ বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছে। তাকে ১৮ মার্চ ২০০৭ যৌথবাহিনী গ্রেফতার করে। মানবাধিকার কর্মী ও সংগঠনগুলোর চাপের মুখে এই ঘটনায় একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয় কিন্তু এই কমিশনের প্রতিবেদন আজ পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি।

১৬. ১৯৯১ সালের বাংলাদেশ আদমশুমারি অনুসারে আদিবাসী মানুষের সংখ্যা ১২ লাখ, অনেক আদিবাসী এই সংখ্যাকে প্রকৃত সংখ্যার তুলনায় অনেক কম বলে মনে করেন।

৪৯. যেসব মানবাধিকার কর্মী বা সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করে, জরুরি অবস্থার সময় তারা বিশেষ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ঐ এলাকায় কর্মরত একটি দাতা সংস্থার একজন কর্মকর্তাকে অপহরণের পর শুধু বর্ণগত কারণে অনেকে গ্রেফতার ও জেরার লক্ষ্যবিন্দুতে পরিণত হয়। অধিকন্তু প্রধানত পার্বত্য এলাকার আদিবাসী জনগণকে নিয়ে গঠিত রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) এবং ইউনাইটেড পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) বিশিষ্ট সদস্যগণও গ্রেফতার ও আটকের শিকার হন অথবা তাদের জেলে আটক রাখার হুমকি দেয়া হয়।

৫০. বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) মধ্যে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ২০ বছর ধরে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চলমান রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটে। এই অঞ্চলে ১৩টিরও বেশি আদিবাসী সম্প্রদায় বাস করে। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ১১ বছর অতিক্রান্ত হলেও এই চুক্তি বাস্তবায়নে সামান্যই উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অঙ্গীকার সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত 'ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন' কার্যকর করা হয়নি, এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন সংশোধনের দাবিও বাস্তবায়ন করা হয়নি। এই এলাকায় স্থাপিত নিরাপত্তা বহিনীর (সেনা, বিডিআর, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন) 'অস্থায়ী ক্যাম্প'গুলোর অল্পসংখ্যক প্রত্যাহার করা হলেও অধিকাংশ ক্যাম্প এখনো রয়ে গেছে। অধিকন্তু পার্বত্য জেলা কাউন্সিল এখন পর্যন্ত এই এলাকার স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পায়নি।[১৭]

৫১. **ধর্মীয় বৈষম্য :** সরকারি চাকরি বা কার্যালয়ে এবং সেই সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ খুবই কম থাকার কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য এখনও বিস্তৃতভাবে বর্তমান আছে।

নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর দ্বারা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটছে বহুবার। উদাহরণস্বরূপ, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে ২০০৪-০৫ সালে ইসলামি গোষ্ঠীরা আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ও তাদের উপাসনালয়ে আক্রমণ চালায় (এসব আক্রমণের ঘটনা ঘটে ঢাকার নাখালপাড়ায়, চট্টগ্রামের চক বাজারে, খুলনার নিরালায় এবং বগুড়ায়)। সূত্রমতে, একটি ঘটনায় পুলিশ ইসলামি গোষ্ঠীর কথামতো কাজ করে এবং একটি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয় যেখানে লেখা ছিল, 'এটা কোনো মসজিদ নয়, এটা কাদিয়ানিদের একটি উপাসনালয়, কোনো মুসলমান এটাকে মসজিদ মনে করবেন না।' সেই সময়ের সরকার এই ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়। বর্ণিত সেই ভবনকে রক্ষা করার জন্য নাগরিক সমাজের সদস্যরা অনেকবার সেখানে জমায়েত হয়েছেন। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচারণাকারী একটি ইসলামি গোষ্ঠীর দাবির মুখে ৮ জানুয়ারি ২০০৪ সরকার (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত বাংলাদেশ–এর নির্দিষ্ট কিছু প্রকাশনাকে বাতিল করে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট এই বাতিল আদেশকে স্থগিত করেন।

১৭. 'ডিমান্ড ফর ফুল ইম্প্লিমেন্টেশন অব সিএইচটি অ্যাকোর্ড' [পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন দাবি], শান্তিময় চাকমা, ডেইলি স্টার, ২ ডিসেম্বর ২০০৭; 'সন্তু লারমা মিটস্ উইথ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী অ্যাবাউট ইম্প্লিমেন্টেশন অব পিস অ্যাকোর্ড" [শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে সন্তু লারমা ইফতেখার আহমেদ চৌধুরীর সাথে দেখা করেছেন], সমকাল, ৩০ মার্চ ২০০৭।

৫২. ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুরা যে কারণে সবচেয়ে ভয়ঙ্করভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে সেটা হলো– শত্রু সম্পত্তি আইন ১৯৬৫ এবং অর্পিত সম্পত্তি আইন ১৯৭৪। এ আইন দুটির অপব্যবহার এবং বেআইনিভাবে ব্যবহার করে তাদের সম্পত্তি থেকে বেদখল করা হয়েছে। ব্যাপক নিন্দা, প্রতিবাদ ও গবেষণার মাধ্যমে এসব আইনের বৈষম্যমূলক ফলাফলকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। পরে ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের বিধান অনুসারে সরকার পরবর্তী ১৮ মাসের মধ্যে সব 'অর্পিত সম্পত্তি'র তালিকা প্রকাশ করবে। তবে তৎকালীন সরকার ২০০২ সালে এই সময়সীমাকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং এর ফলস্বরূপ আইনটি এখন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০০৬ সালের একটি গবেষণা থেকে দেখা যায়, ১৯৬৫ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ১২ লাখ হিন্দু পরিবার তাদের প্রায় ২৬ লাখ একর জমি এবং অন্যান্য অস্থায়ী সম্পত্তি হারিয়েছে। এর মধ্যে ২ লাখ হিন্দু পরিবার তাদের জমি হারিয়েছে ২০০১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে।[১৮] সম্প্রতি আইনটিকে পুনরায় সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হলে আসক, ব্লাস্ট, নিজেরা করি এবং এএলআরডিসহ অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠন কঠোর সমালোচনা করে বলে যে, যেভাবে সংশোধনী আনা হচ্ছে তাতে হিন্দুদের সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে আরো জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে।

৫৩. **গোত্রগত বৈষম্য :** সংবিধানে জাতি বা গোত্রগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকলেও হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের দলিত গোষ্ঠী তাদের দৈনন্দিন জীবনে নানামুখী বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– জীবিকা ও সুযোগের ক্ষেত্রে তাদের আলাদা করা, শোষণ করা এবং বঞ্চিত করা, তাদের ভূমি দখল করা, ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়া, ভয়ভীতি দেখানো ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্য নির্যাতন যেমন– ধর্ষণ এবং কখনো কখনো তারা হত্যারও শিকার হচ্ছে। 'অপরিচ্ছন্ন' হিসেবে বিবেচনা করে তাদের তথাকথিত 'পরিচ্ছন্ন'দের থেকে পৃথক বসবাস করতে বাধ্য করা হচ্ছে। মসজিদ, মন্দির, দোকানপাট এবং হোটেলসহ পাবলিক প্লেসে প্রবেশের অধিকার থেকে তারা নিয়মিতভাবে বঞ্চিত হচ্ছে।

৫৪. মৌলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলো ব্যবহারের সুযোগের ক্ষেত্রেও দলিত সম্প্রদায় বৈষম্য এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের মোট দলিতের প্রায় ৬০ ভাগ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলে তারা দরিদ্রতা ও শোষণের বৃত্তে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হচ্ছে। যারা কোনো রকমে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হয় তারাও তাদের সহপাঠী ও স্কুল কর্তৃপক্ষের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়। এ কারণে অনেক দলিত ছেলে মেয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার আগেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করছে এবং একটা নিশ্চিত কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক দলিত তাদের বাসস্থানের ক্ষেত্রেও সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মের যৌথ চাপের ফলে আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ হতে পারে না। যার ফলে বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায়কে শহরের এক প্রান্তে ঠেলে দেয়া হয় এবং তারা অনিশ্চিতভাবে

১৮. ড. আবুল বারকাত, অ্যান ইনকোয়ারি ইন টু দি কজেস এবং কনসিক্যুয়েন্সেস অব ডিপ্রাইভেশন অব হিন্দু মাইনোরিটিজ ইন বাংলাদেশ থ্রু দি ভেস্টেট প্রোপার্টি অ্যাক্ট, এএলআরডি, ঢাকা ২০০৬।

রেলসড়কের পাশে অথবা দুর্গন্ধযুক্ত, আবর্জনাপূর্ণ, ঘনবসতিপূর্ণ সরকারি 'কলোনি'তে (শুধু ঢাকা শহরেই এরূপ ৩০টি কলোনি আছে) বাস করতে বাধ্য হয়। এসব কলোনি জীবনের একটা দুঃখজনক বৈশিষ্ট্য হলো এখানে অনেক মানুষ একত্রে বাস করে এবং এ কারণে তারা বিশেষ করে শিশুরা প্রতিবছরই অপুষ্টি, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া অথবা অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে কোনো হাসপাতাল বা ডাক্তারের চিকিৎসা ছাড়াই মারা যায়। দলিত সম্প্রদায় সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের মনোভাব হলো 'তারা ভিন্ন প্রকৃতির', এ কারণে রাষ্ট্রও কার্যত একই মনোভাব পোষণ করে।[১৯]

৫৫. **প্রতিবন্ধিত্বের কারণে বৈষম্য :** সম্প্রতি প্রতিবন্ধীদের স্বীকৃতি এবং তাদের অধিকার বাস্তবায়নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– প্রতিবন্ধী বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ৪৬টি ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে, জাতীয় প্রতিবন্ধী ও উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এনডিডিএফ) নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, ভোটার নিবন্ধন ফরমে প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা তথ্য সংগ্রহের বিধান রেখে ভোটার তালিকায় প্রতিবন্ধীদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রে নিবন্ধন ও বিতরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫৬. বৈষম্যমূলক বিভিন্ন আইন (যেমন– লুনাসি অ্যাক্ট ১৯১২, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং মানসিক রোগীদের অধিকারকে সরাসরি লঙ্ঘন করেছে) এবং প্রতিবন্ধীদের প্রতি মানুষের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা ও সেবা প্রদানে অপ্রতুলতার কারণে প্রতিবন্ধীর অধিকার বিষয়ে এখনো নানামুখী উদ্বেগ রয়েই গেছে। প্রতিবন্ধী বিষয়টিকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে যুক্ত করার পরিবর্তে এখনো সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা ও প্রতিবন্ধকতার ধরন সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাবে এ বিষয়ে গভীর পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। প্রতিবন্ধীদের অধিকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে– প্রতিবন্ধীদের চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা (যেমন– সহকারী বিচারক পদের জন্য শারীরিক সক্ষমতা প্রয়োজন),[২০] নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি না মানা (যেমন– প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ) এবং ইতিবাচক পদক্ষেপের অভাব (প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করে এমন ব্যক্তির দাবি হলো তাদের জন্য ১০% কোটা বরাদ্দ করা হোক)।

৫৭. প্রায় ৯৬% প্রতিবন্ধী শিশু মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ থেকে বুঞ্চিত হচ্ছে;[২১] সরকার (সোস্যাল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট) প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য যে সামান্য পরিমাণ বিশেষ বিদ্যালয় পরিচালনা করে সেগুলোও মানসম্মত নয় এবং এগুলো শিক্ষা

১৯. আইডিএসএন-এর সহায়তায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব দলিত স্টাডিজ (আইআইডিএস) গোত্রগত বৈষম্য সংক্রান্ত একটি দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক গবেষণা করে। এই অংশটি নেয়া হয়েছে উক্ত গবেষণা এবং ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীর বাংলাদেশ সংক্রান্ত একটি গবেষণা থেকে।

২০. জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক সহকারী বিচারক নিয়োগের বিজ্ঞাপন, প্রথম আলো, ২ আগস্ট ২০০৭।

২১. ইএসটিইইম-২ (ESTEEM II) প্রজেক্ট স্টাডি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ২০০২।

মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয় না।[২২] প্রতিবন্ধী শিশুদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই এবং এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনাও নেই। বিদ্যমান আইন সঠিকভাবে না মানার কারণে ইমারতগুলোতে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রবেশ করা এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিরাজ করছে (১৯৯৬ সালের ইমারত নির্মাণ বিধিমালা এবং ২০০৬ সালের ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় সরকারি ও ব্যক্তিগত সব ইমারতে র‍্যাম্প বা প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার উপযোগী ঢালু প্রবেশপথ রাখার বিধান আছে)।

৫৮. বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধকতা আছে। তাদের শরীর ও সম্পত্তির ওপর সহিংসতার ক্ষেত্রে তারা খুব সামান্যই প্রতিকার পায়। যেমন– ২০০৬ সালে প্রায় ৬৯ জন প্রতিবন্ধী যাদের বেশিরভাগই নারী হত্যা, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক, নির্যাতন, প্রতারণা, অপহরণ, ছিনতাই, উচ্ছেদ এবং জমি দখলের শিকার হয়। এসব ঘটনা সঠিকভাবে তদন্ত হয়েছিল কিনা অথবা এসব ঘটনার কোনো বিচার হয়েছিল কিনা এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।[২৩] প্রতিবন্ধীরা আইনের সমান সুরক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ শ্রবণ প্রতিবন্ধী বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী অথবা যারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কোনো বাস্তব ব্যবস্থা আদালতের নেই, সেখানে বাংলা ইশারা ভাষা (সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ) ব্যবহার করারও কোনো অনুমতি নেই।

মানবাধিকার প্রক্রিয়ার সাথে সহযোগিতা

৫৯. **চুক্তি কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা :** বাংলাদেশ বর্তমানে বিভিন্ন চুক্তি পর্যবেক্ষণ কর্তৃপক্ষের কাছে ১২টি প্রতিবেদন দাখিল করতে দায়বদ্ধ [*দেখুন সংযুক্তি–৫, বাংলাদেশ যেসব প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং যেসব চুক্তি কর্তৃপক্ষ এসব প্রতিবেদন বিবেচনা করেছে*]।

৬০. চুক্তি কর্তৃপক্ষগুলোর সুপারিশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত খুবই সীমিত অগ্রগতি সাধন করেছে। বর্ণবৈষম্য নিরোধ কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রতিবেদন সময়ে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বস্তবায়নের বাংলাদেশের অগ্রগতি একেবারে নগণ্য। হাইকোর্টের একটি রায়ের আলোকে বর্তমান সরকার পার্বত্য এলাকায় দেওয়ানি আদালত স্থাপন করেছে। বর্ণ, নৃতত্ত্ব বা ভাষার কারণে বৈষম্য ছাড়া সবার জন্য আইনের সমান সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অন্য যেসব পদক্ষপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তার কোনোটাই এখনো গৃহীত হয়নি। ২০০৪ সালে সিডও কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, সিডও সনদের সংরক্ষণ প্রত্যাহারের ব্যাপারে এখনো কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অধিকন্তু, খসড়া নাগরিকত্ব আইন শুধু সন্তানের নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করেছে; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে বৈষম্য খসড়া আইনেও বিদ্যমান। বিগত নির্বাচিত সরকার বা বর্তমান সরকার প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আইনটি প্রণয়নের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আবার পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বর্তমান সরকার এবং নারী অধিকার কর্মীদের মধ্যে আলোচনা সত্ত্বেও এ সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। লৈঙ্গিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী

২২. আসক, হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ ২০০৬, আসক, ঢাকা ২০০৭, পৃ. ২০৩।

২৩. আসক, হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ ২০০৬, আসক, ঢাকা ২০০৭, পৃ. ২০৩।

পারিবারিক আইন সংস্কারের বিষয়েও কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ২০০৩ সালে শিশু অধিকার কমিটির প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে বলা যায়, ফৌজদারি দায়ে অভিযুক্ত করার জন্য কোনো ব্যক্তির সর্বনিম্ন বয়স সাত থেকে বাড়িয়ে নয় বছর করা হয়েছে; কিন্তু প্রতিবেদন দাখিলের সময় পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে মিল রেখে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য কোনো সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করা হয়নি অথবা সন্তানের নাগরিকত্ব নির্ধারণে লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করা হয়নি। সেই সাথে, শারীরিক শাস্তি প্রতিরোধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বা জাতীয় শরণার্থী আইন প্রণয়নে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি এবং শরণার্থী সনদে স্বাক্ষর করা হয়নি, অথবা শিশু সংবেদনশীল কোনো অভিযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়নি। [*বাংলাদেশ সম্পর্কিত সার বক্তব্যের জন্য দেখুন সংযুক্তি–৬*]

৬১. **বিশেষ পদ্ধতির সাথে সহযোগিতা :** মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ বিশেষ পদ্ধতির সাথে বাংলাদেশ সাধারণভাবে কার্যকর কোনো সহযোগিতা করেনি। প্রতিবেদন সময়ের মধ্যে শুধু খাদ্য অধিকার সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদক বাংলাদেশ সফর করেছে (২০০৪ সালে), অন্যরা বাংলাদেশ সফরের আগ্রহ দেখালেও বাংলাদেশের কাছ থেকে কোনো সাড়া পায়নি [*দেখুন সংযুক্তি-৭, বিশেষ ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ*]

সংযুক্তি-১

ফোরামভুক্ত সংগঠনগুলো:

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)- সচিবালয়
এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন (এএসএফ)
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (বিএমপি)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
বাংলাদেশ দলিত অ্যান্ড এক্সক্লুডেড রাইটস মুভমেন্ট (বিডিইআরএম)
সেন্টার ফর রিহাবিলিটেশন অব টর্চার সারভাইভরস (সিআরটিএস)
ডি.নেট
কর্মজীবী নারী
নাগরিক উদ্যোগ
নারী উদ্যোগ কেন্দ্র
নিজেরা করি
নারী পক্ষ
ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশনস উইথ ডিজাবল (এনএফওডব্লিউডি)
রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কালেকটিভ (আরডিসি)
স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট (স্টেপস্)
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

বিকল্প প্রতিবেদনটি ফোরামের পক্ষে এর সচিবালয় আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। এটি সম্পাদনার প্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন সারা হোসেন। সম্পাদনা পরিষদে আরও ছিলেন সুলতানা কামাল, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. মেজবাহ কামাল। এটি তৈরিতে বিভিন্নভাবে তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, ড. হামিদা হোসেন, জাকির হোসেন, ড. দীনা সিদ্দিকী, শিরীন সুলতানা, ড. রায়হান রশীদ, ড. নওরীন তামান্না এবং ড. আহমেদ জিয়াউদ্দিন।

সংযুক্তি-২

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতে বাংলাদেশের অনুসমর্থন

মুখ্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি	ঘোষণা/সংরক্ষণ	অনুসমর্থন/অনুমোদন
বর্ণবৈষম্যবিরোধী সনদ (সিইআরডি)	১১ জুন ১৯৭৯	
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ (আইসিইএসসিআর)	৫ অক্টোবর ১৯৯৮	**ঘোষণা** অনুচ্ছেদ-১ (আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার), ২ (রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা), ৩ (নারী-পুরুষের সমতা), ৭ (ন্যায্য ও অনুকূল কাজের পরিবেশের অধিকার), ৮ (ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার), ১০ (পরিবার গঠনের এবং মা ও শিশুর সুরক্ষার অধিকার) এবং ১৩ (সবার জন্য শিক্ষার অধিকার)
নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ (আইসিসিপিআর)	৬ সেপ্টেম্বর ২০০০	**ঘোষণা** অনুচ্ছেদ-১০ (কারাবন্দিদের অধিকার), ১১ (শুধু চুক্তি পালনে ব্যর্থতার কারণে কারাদণ্ডের বিধান), ১৪ (বিচার এবং শাস্তির ক্ষেত্রে সুরক্ষা) **সংরক্ষণ** অনুচ্ছেদ ১৪ (অনুপস্থিতিতে বিচার না করা)
আইসিসিপিআর-এর প্রথম ঐচ্ছিক প্রটোকল (ব্যক্তিগত অভিযোগ গ্রহণ)	অনুমোদন করা হয়নি	
আইসিসিপিআর-এর দ্বিতীয় ঐচ্ছিক প্রটোকল (মৃত্যুদণ্ড বিলোপ সংক্রান্ত)	অনুমোদন করা হয়নি	
নারীর প্রতি সবধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)	৬ নভেম্বর ১৯৮৪	**সংরক্ষণ** অনুচ্ছেদ ২ (বৈষম্যহীনতা এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার নীতিমালা), ১৬(১)(গ) (বিবাহ ও তালাকের ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা)
সিডও সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল	৬ সেপ্টেম্বর ২০০০	**ঘোষণা:** অনুচ্ছেদ ১০(১) (তদন্ত পদ্ধতি সম্পর্কিত)
নির্যাতনবিরোধী সনদ	৫ অক্টোবর ১৯৯৮	**সংরক্ষণ:** অনুচ্ছেদ ১৪ (নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিকে ন্যায্য ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান)

মুখ্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি	ঘোষণা/সংরক্ষণ	অনুসমর্থন/অনুমোদন
নির্যাতন বিরোধী সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল (আটকের স্থান পরিদর্শনের অনুমতি)	অনুমোদন করা হয়নি	
শিশু অধিকার সনদ	৩ আগস্ট ১৯৯০	**সংরক্ষণ:** অনুচ্ছেদ ১৪(১) (শিশুদের চিন্তা, বিশ্বাস এবং ধর্মের স্বাধীনতা) এবং অনুচ্ছেদ ২১ (শিশু দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত)
শিশু অধিকার সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল (সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের নিয়োজিত করা সংক্রান্ত)	৬ সেপ্টেম্বর ২০০০	**ঘোষণা** অনুচ্ছেদ ৩ (২) (সশস্ত্র সংগঠনে শিশুদের অন্তর্ভুক্তির ন্যূনতম বয়স)
শিশু অধিকার সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল (শিশুদের নিয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত)	৬ সেপ্টেম্বর ২০০০	
প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত সনদ	৩০ নভেম্বর ২০০৭	
প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল	অনুমোদন করা হয়নি	
অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার বিষয়ক সনদ	৭ অক্টোবর ১৯৯৮ স্বাক্ষর করা হয়েছে, অনুমোদন করা হয়নি	
বলপূর্বক অন্তর্ধান সংক্রান্ত সনদ	অনুমোদন করা হয়নি	
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সংক্রান্ত রোম সংবিধি	১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ স্বাক্ষর করা হয়েছে অনুমোদন করা হয়নি	
গণহত্যার বিচার ও প্রতিকার সংক্রান্ত সনদ	৫ অক্টোবর ১৯৯৮	
জেনেভা কনভেনশনগুলো	৪ এপ্রিল ১৯৭২	
জেনেভা কনভেনশনের ১নং প্রটোকল	৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮০	
জেনেভা কনভেনশনের ২নং প্রটোকল	৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮০	
নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ ১৯৫৩	৫ অক্টোবর ১৯৯৮	
বিয়ের সম্মতি, বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স এবং বিয়ে নিবন্ধন সংক্রান্ত সনদ ১৯৬২	৫ অক্টোবর ১৯৯৮	

মুখ্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি	ঘোষণা/সংরক্ষণ	অনুসমর্থন/অনুমোদন
পাচার ও জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা সংক্রান্ত সনদ ১৯৫০	১১ জানুয়ারি ১৯৮৫	
দাসত্ববিরোধী সনদ ১৯২৬ এবং এর প্রটোকলগুলো	৭ জানুয়ারি ১৯৮৫	
শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সংক্রান্ত ইউনেস্কো সনদ ১৯৬০	অনুমোদন করা হয়নি	
শরণার্থী বিষয়ক সনদ ১৯৫১	অনুমোদন করা হয়নি	
আইএলও সনদ নং-১৩৮	অনুমোনদ করা হয়নি	

সংযুক্তি-৩

মানবাধিকার কাউন্সিল নির্বাচন ২০০৬-এর পূর্বে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে করা অঙ্গিকারগুলো

আমরা যদি মানবাধিকার কাউন্সিলে নির্বাচিত হই তাহলে নিম্নের কার্যাবলি সম্পাদন করব–

১. মানবাধিকার কাউন্সিল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ যে কার্যাবলি পরিচালনা করছে কোনোরূপ বৈষম্য ব্যতীত এবং স্বচ্ছতা ও সমতা বজায় রেখে বাংলাদেশ সেই কাজে সর্বতোভাবে সহায়তা প্রদান করবে।

২. সর্বজনীনতা, নিরপেক্ষতা, বস্তুনিষ্ঠতার ভিত্তিতে কোনোরূপ বাছবিচার ছাড়া গঠনমূলক আন্তর্জাতিক মতামত ও সহযোগিতার নীতিতে কাউন্সিল যেসব কার্যাবলি পরিচালনা করছে তাতে বাংলাদেশের সহযোগিতা থাকবে।

৩. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে অর্থবহ আলোচনা ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। সেই সাথে রাষ্ট্রগুলোর মানবাধিকার বাধ্যবাধকতা পরিপূর্ণ করতে উপদেষ্টামূলক ভূমিকা, কৌশলগত সহায়তা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪. কাউন্সিলের কাজগুলোকে পর্যালোচনা ও যুক্তিযুক্ত করতে এবং কমিশনের ম্যান্ডেট, কার্যপদ্ধতি, কার্যাবলি, এবং দায়দায়িত্বের উন্নয়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা হবে।

৫. ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ পদ্ধতির আওতায় বাংলাদেশের প্রতিবেদন দাখিলের সময় আসলে বাংলাদেশ কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা, শর্ত ও পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

৬. দেশের সব মানুষের উন্নয়নে বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন এবং আদিবাসীসহ দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বাংলাদেশ এর কার্যাবলি অব্যাহত রাখবে।

৭. দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে গৃহীত কার্যাবলিকে আরো শক্তিশালী করা হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা অব্যাহত রাখা হবে।

৮. জাতীয় নীতি ও কার্যপদ্ধতি গ্রহণকালে বাংলাদেশের সংবিধান, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার সনদে বর্ণিত মৌলিক নীতিগুলো বাস্তবায়নে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৯. বাংলাদেশ যেসব সনদের পক্ষ সেসব সনদের বাধ্যবাধকতা পূরণে আরো শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০. পক্ষভুক্ত সনদ ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার দলিলের সাথেও গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট থাকবে।

১১. মানবাধিকারের অধিকতর উন্নয়নের স্বার্থে কাউন্সিলের বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশলগুলোর প্রতি বাংলাদেশের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

১২. কাউন্সিলের কাজে এনজিওগুলোর গঠনমূলক ভূমিকার প্রতি সমর্থন অব্যাহত থাকবে। কাউন্সিলের কাজে উন্নয়নশীল দেশের এনজিওগুলো যাতে আরো কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে বাংলাদেশ সচেষ্ট হবে।

১৩. উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন নীতিসহ বাংলাদেশের জাতীয় নীতিগুলোতে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন ও সংরক্ষণকে গুরুত্বসহ অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং এক্ষেত্রে নারী, শিশু, সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

১৪. সুশাসন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং আইনের শাসন উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে আরো শক্তিশালী ও সমন্বিত করার কার্যকরি উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

১৫. জাতীয় উন্নয়ন নীতির মাধ্যমে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসহ জনগণের অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা বিধান অব্যাহত থাকবে।

১৬. যত দ্রুত সম্ভব জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১৭. যত দ্রুত সম্ভব বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে।

সংযুক্তি-৪

২০০৪ থেকে জুন ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

নির্যাতনের ধরন	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮ (জুন পর্যন্ত)
ক্রসফায়ার (গ্রেফতার ছাড়া)	৪৬	৯৪	৬২	৮১	৫৪
ক্রসফায়ার (আটক অবস্থায়)	৮৮	২৬০	১৯৬	৩৪	৪
দৈহিক নির্যাতন (গ্রেফতার ছাড়া)	৩	১	৭	৯	২
দৈহিক নির্যাতন (আটক অবস্থায়)	২৩	১১	২৬	১৮	৭
গুলি করে হত্যা (গ্রেফতার ছাড়া)	৩৩	১১	৬১	২৪	৫
গুলি করে হত্যা (আটক অবস্থায়)	১২			১৪	১
আত্মহত্যা (পুলিশের দাবি মতে)	২	-	-	-	১
মোট	**২০৭**	**৩৭৭**	**৩৫২**	**১৮০**	**৭৪**

সূত্র : আসক ডকুমেন্টেশন ইউনিট

সংযুক্তি-৪.১ **নারী নির্যাতনের তুলনামূলক তথ্য (২০০৪-২০০৭)**

নির্যাতনের ধরন	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭
এসিড সন্ত্রাস	২২৮	১৩০	১৪২	৯৫
যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন	৩৫২	৩৫৬	৩৩৪	২৯৪
ধর্ষণ	৬১৮	৫৮৫	৫১৫	৪৩৬
গণধর্ষণ	৩৫৯	২৫০	২২৬	১৯৮
ফতোয়া সংক্রান্ত নির্যাতন	৩৫	৪৬	৩৯	৩৫
পারিবারিক নির্যাতন	২৬৪	৩৩৩	৩০১	২৮৩
মোট				

সূত্র : আসক ডকুমেন্টেশন ইউনিট

সংযুক্তি-৪.২ **২০০৭ সালে কর্মস্থলে মৃত্যু**

ক্ষেত্র	মৃতের সংখ্যা
নির্মাণ শিল্প	১০৭
উৎপাদন শিল্প	৬৮
চাকরি	৩৬
জাহাজ ভাঙা শিল্প	৬
বিবিধ (বন্দর, জাহাজে পণ্য পরিবহন)	১২
মোট	**২২৯**

সূত্র : ডকুমেন্টেশন অব বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর লেবার স্টাডিজ (বিলস)

সংযুক্তি-৫

চুক্তি কমিটি	সর্বশেষ প্রদেয় রিপোর্ট	সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ	যে রিপোর্টগুলি বাকি রয়েছে
আইসিসিপিআর			প্রাথমিক রিপোর্টসহ দুটি রিপোর্ট বাকি রয়েছে
আইসিইএসসিআর			প্রাথমিক রিপোর্টসহ দুটি রিপোর্ট বাকি রয়েছে
সিইআরডি	সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম এবং এগারোতম রিপোর্ট দেয়ার কথা ছিল ১৯৯২-এর জুলাই মাসে, রিপোর্ট দেয়া হয়েছে মার্চ ২০০০-এ যা ২০০১-এর মার্চ মাসে পর্যালোচনা করা হয়েছে	মার্চ ২০০১	তিনটি রিপোর্ট বাকি রয়েছে
সিডও	পঞ্চম রিপোর্ট প্রদানের কথা ছিল ২০০১-এর ডিসেম্বরে, প্রদান করা হয়েছে ২০০২-এর ডিসেম্বরে। পর্যালোচনা করা হয়েছে ২০০৪-এর জুলাই মাসে	জুলাই ২০০৪	ষষ্ঠ ও সপ্তম রিপোর্ট যৌথভাবে দেয়ার কথা ২০০৯-এর ডিসেম্বর মাসে
সিআরসি	২০০৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তৃতীয় ও চতুর্থ রিপোর্ট যৌথভাবে প্রদান করা হয়েছে	সেপ্টেম্বর ২০০৩	পঞ্চম রিপোর্ট বাকি রয়েছে
সিআরসি ঐচ্ছিক প্রটোকল (সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের নিয়োজিত করা সংক্রান্ত)	২০০৪ সালের ১৬ নভেম্বর প্রাথমিক রিপোর্ট দেয়া হয়	জানুয়ারি ২০০৬	
সিআরসি ঐচ্ছিক প্রটোকল (শিশুদের নিয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত)	২০০৫ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রাথমিক রিপোর্ট দেয়া হয়	৫ জুলাই ২০০৫	
সিএটি			প্রাথমিক রিপোর্টসহ তিনটি রিপোর্ট বাকি আছে

সংযুক্তি-৬

জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কমিটি (সিইআরডি), নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কমিটি (সিডও) এবং শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) অনুসারে গঠিত কমিটি কর্তৃক আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতা পূরণে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কিত মন্তব্য

২০০১ সালে জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কমিটি (সিইআরডি) বাংলাদেশ সম্পর্কে নিম্নরূপ সুপারিশ প্রদান করেছে:

- স্থানীয় আইন সংক্রান্ত কনভেনশনের ৪ অনুচ্ছেদের বিধানের ক্ষেত্রে পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করতে হবে, জাতিগত বৈষম্য সৃষ্টিকারী প্রতিটি কাজকে দণ্ডনীয় করতে হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের পাশাপাশি উপযুক্ত আদালত ও ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমেও কনভেনশনের ৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতিগত বৈষম্য কার্যকরভাবে প্রতিরোধ ও বৈষম্য সৃষ্টিকারী কাজের যথোপযুক্ত প্রতিকারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- জাতি, বর্ণ, বংশ অথবা জাতীয়তা বা নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে কোনোরূপ বৈষম্য না করে বাংলাদেশের সব অংশের মানুষের জন্য নির্যাতন বা শারীরিক ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- এ বিষয়ে ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে আরো জোরদার করতে হবে। রাষ্ট্রপক্ষ এর পরবর্তী প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলি, ভূমি কমিশনের কার্যাবলির কার্যকর ফলাফল, পার্বত্য চট্টগ্রামের শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে আনা ও পুনর্বাসিত করা, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের জন্য গঠিত বিশেষ টাস্কফোসের কার্যাবলি, ভূমি কমিশনের পরামর্শ অনুসারে বাঙালি সেটেলারদের পার্বত্য এলাকার বাইরে পুনর্বাসন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করতে হবে।
- সব গোষ্ঠী ও গোত্রের অধিকার ভোগসহ কনভেনশনের ৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকার সম্পর্কে পরবর্তী প্রতিবেদনে প্রাসঙ্গিক বিবরণ প্রদান করতে হবে।
- শিক্ষার মাধ্যমে মানবাধিকার সম্পর্কে বিশেষ করে এই সনদ সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রমকে অধিকতর শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানকালে কনভেনশনের বিধান সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- কনভেনশনের লঙ্ঘনে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিকারসহ এ সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে পরবর্তী প্রতিবেদনে তথ্য প্রদান করতে হবে।
- ১৫ জানুয়ারি ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সভায় কনভেনশনের ৮ অনুচ্ছেদের ৬ প্যারার যে সংশোধনী গৃহীত হয় তা অনুস্বাক্ষর করতে হবে।

২০০৪ সালে নারীর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কমিটি (সিডও কমিটি) বাংলাদেশ সম্পর্কে নিম্নরূপ সুপারিশ প্রদান করেছে:

- সিডও সনদের সংরক্ষণ প্রত্যাহার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ত্বরান্বিত করতে হবে।
- কনভেনশনের ১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নারীর প্রতি বৈষম্য সংক্রান্ত সংজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- কনভেনশনের বিধানের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্য রেখে এবং কোনোরূপ বিলম্ব না করে একটি

সমন্বিত পারিবারিক আইন প্রণয়ন করতে হবে।

- নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপে বিলম্ব না করে অতিসত্বর অনুচ্ছেদ ৯-এর বিধানের আলোকে একটি নতুন নাগরিকত্ব আইনের প্রণয়নের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

২০০৩ সালে শিশু অধিকার সনদ অনুসারে গঠিত কমিটি (সিআরসি কমিটি) বাংলাদেশ সম্পর্কে নিম্নরূপ সুপারিশ প্রদান করেছে:

- সনদের বিধান ও নীতির সাথে সব দেশীয় আইনের সমন্বয় সাধনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, বিশেষ করে ফৌজদারি দায় এবং বিবাহ, শিশুশ্রম ও ক্ষতিকর প্রথাগত চর্চা যা শিশুদের ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়সসীমা নির্ধারণকারী আইনি বিধানগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুসারে ফৌজদারি দায়ের ক্ষেত্রে শিশুদের ন্যূনতম বয়সসীমা বাড়াতে হবে।
- শিশু বিষয়ক মহাপরিচালকের কার্যালয় স্থাপন উদ্যোগ ত্বরান্বিত করতে হবে।
- মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সংবিধি (প্যারিস নীতিমালা, সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত ৪৮/১৩৪) এবং স্বাধীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সংক্রান্ত সিআরসি কমিটির সাধারণ মতামত নম্বর ২-এর নীতিমালা অনুসারে স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কার্যাক্রমকে ত্বরান্বিত করতে হবে।
- আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুসারে শিশুদের কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়সসীমা নির্ধারণ করতে হবে।
- এই নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যে, ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত দেশীয় আইন সারাদেশে সম্মানিত ও অনুসরিত হচ্ছে।
- বাবা অথবা মায়ের কাছ থেকে শিশুরা যেন নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে এবং সেই সাথে যেন তারা স্থানীয়দের মতো করে সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে সে বিষয়ে আইন সংশোধন করতে হবে। বিশেষ করে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের মধ্যে শারীরিক শাস্তির পরিবর্তে ইতিবাচক ও অসহিংস নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করতে হবে।
- জাতীয় শরণার্থী আইন গ্রহণ করতে হবে এবং ১৯৫১ সালের শরণার্থী সংক্রান্ত কনভেনশন ও ১৯৬৭ সালের প্রটোকলে পক্ষভুক্ত হতে হবে।
- শিশুদের অভিযোগ গ্রহণ এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে শিশু সংবেদনশীল এবং শিশুদের নাগালযোগ্য একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সংযুক্তি-৬

সর্বশেষ সফর	খাদ্যের অধিকার সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি সফর করে ২০০২ সালে
যাদের সফরের অনুরোধে সরকার রাজি হয়নি	বসতির অধিকার সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি (২০০৫ সালে অনুরোধ পাঠিয়েছেন), সংখ্যালঘু সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি (২০০৬ সালে অনুরোধ পাঠিয়েছেন), সংক্ষিপ্ত বিচার সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি (২০০৬ সালে অনুরোধ পাঠিয়েছেন), বিচারক ও আইনজীবীদের নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি (২০০৭ সালে অনুরোধ পাঠিয়েছেন)
যাদের সফরের অনুরোধে সরকার রাজি হয়েছে	ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি (২০০৩ সালে অনুরোধ পাঠিয়েছেন)

চতুর্থ অধ্যায়

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বেসরকারি প্রতিবেদনের সঙ্কলন

অনুবাদঃ এটিএম মোরশেদ আলম, আসক

পটভূমি এবং রূপরেখা

আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির পরিধি

১. 'অধিকার' এবং 'এফআইডিএইচ' উল্লেখ করেছে যে বাংলাদেশকে নিম্নোক্ত সনদসমূহের অনুমোদন করতে হবে– অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ, জোরপূর্বক অন্তর্ধান বা অপহরণ থেকে সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, শরণার্থীদের অবস্থা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, শিক্ষায় বৈষম্যের বিরুদ্ধে ইউনেস্কো সনদ, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের (আইসিসিপিআর) প্রথম ঐচ্ছিক প্রটোকল, মৃত্যুদণ্ড বিলোপ সংক্রান্ত আইসিসিপিআর-এর দ্বিতীয় ঐচ্ছিক প্রটোকল, শারীরিক নির্যাতনসহ অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর কাজ বা শাস্তি সংক্রান্ত সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল।[২]

এশিয়ান ইন্ডিজেনাস এন্ড ট্রাইবাল পিপলস্ নেটওয়ার্ক (এটিটিপিএন) বলেছে বাংলাদেশের আদিবাসী ও উপজাতি সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুসমর্থন করা উচিত।[৩] ইউপিআর বিষয়ক মানবাধিকার ফোরাম উল্লেখ করেছে যে, বাংলাদেশ শুধুমাত্র নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদের অধীনে ব্যক্তিগত যোগাযোগের পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছে।[৪]

২. 'অধিকার' এবং 'এফআইডিএইচ' বলেছে যে জরুরি অবস্থায় মানুষের নানা ধরনের মৌলিক মানবাধিকার যেমন চলাফেরার স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ-৩৬), সমাবেশের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৭), সংগঠিত হবার স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৮), চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৯), পেশা ও কর্মের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৪০), সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৪২) সহ একাধিক স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।[৫]

সাংবিধানিক আইন ও প্রণীত আইন সংক্রান্ত রূপরেখা

৩. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল উল্লেখ করেছে যে, বাংলাদেশে বিদ্যমান একটি উচ্চ রাজনৈতিক মেরুকরণজনিত অবস্থাসহ ব্যাপক সহিংসতা, মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নির্বাচনে কারচুপির আশংকায় ১১ জানুয়ারি ২০০৭-এ রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থনে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন।[৬]

৪. হিউম্যান রাইটস ফোরাম অন ইউপিআর-এর মতে আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতাগুলি সরাসরি প্রয়োগের আগে অবশ্যই জাতীয় আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক চুক্তিই জাতীয় আইনে সংযোজন করা হয়নি।[৭] ফোরাম উল্লেখ করেছে যে, ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিভিন্ন নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রতিকারের বিধান রয়েছে এবং এসব অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়া যায়। ফোরাম আরও উল্লেখ করে যে, সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্দেশিত রয়েছে। যদিও প্রথাগতভাবে এই সকল মূলনীতিকে আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য নয় বলে ধরা হয়, তবুও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার রক্ষার্থে সুপ্রিম কোর্ট বেশ কিছু মামলার ক্ষেত্রে এসব মৌলিক নীতিসমূহের প্রয়োগ বা ব্যবহার ঘটিয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত অবকাঠামো

৫. ফোরাম উল্লেখ করে যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৭ জারি সত্ত্বেও জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের এখন পর্যন্ত কোনো কর্মতৎপরতা নেই। মানবাধিকার সংগঠনসমূহ একটি সদাজাগ্রত এবং কার্যকরি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে প্রস্তাবিত কমিশনের ভূমিকা বা যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, বিশেষ করে বাছাই কমিটি গঠনে নির্বাহী বিভাগের প্রাধান্য; কমিশনের বহুমাত্রিকতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা বা সদিচ্ছার অভাব; আদালতে বা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলাসমূহ তদন্তের জন্য কমিশনের আইনগত ক্ষমতা ও পরিধির সীমাবদ্ধতা, এবং কমিশনের সুপারিশ মানতে সরকারকে বাধ্য করার ক্ষমতা না থাকা উদ্বেগের বিষয়। তাছাড়া স্পষ্ট সাংবিধানিক এবং আইনগত বিধান থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ন্যায়পাল নিয়োগ হয়নি।

৬. বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম), নাগরিক উদ্যোগ, এবং আন্তর্জাতিক দলিত সলিডারিটি নেটওয়ার্ক (আইডিএসএন) সুপারিশ করেছে যে নব্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে দলিত অধিকারের সপক্ষে একজন প্রতিনিধিকে মনোনয়ন দিতে হবে এবং তিনি বর্ণ, কর্ম এবং জন্ম বা বংশ পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্যের ওপর গবেষণা পরিচালনা করবেন[১০]।

নীতিগত উদ্যোগ

৭. ফোরাম উল্লেখ করে যে নির্ভরযোগ্য এবং স্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে জাতীয় খাদ্যনীতি গ্রহণ করা হয়। ফোরাম আরো লক্ষ্য করেছে যে ১৯৯৭ সালের মূল জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৪ সালে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করা হয় যার মূল উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে সীমাবদ্ধ করাই নয় বরং নারীত্বের একটি বিশেষ অর্থ বা ব্যাখ্যা রচনা করা এবং পরিবারে নারীর প্রথাগত ভূমিকাকেই উৎসাহিত করা। নারী অধিকার আন্দোলনকারীদের দীর্ঘ সময়ের অবিচল দাবির মুখে যখন বর্তমান সরকার ৮ মার্চ ২০০৮ একটি নতুন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করে তখন তা সাদরে গৃহীত হয়। তবে কিছুসংখ্যক ইসলামী গোষ্ঠী এর বিরোধিতা করে প্রকাশ্য রাস্তায় বিক্ষুব্ধ অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, নারী অধিকার কর্মীদের ভীতি প্রদর্শন করে এবং তারা দাবি করে যে নতুন এই নীতিমালা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমঅধিকার নিশ্চিত করে বিধায় এটি পবিত্র কোরআনের অনুবিধির লঙ্ঘন বা পরিপন্থী। ফোরাম লক্ষ্য করেছে যে, ১৯৯৭ সালের মূল নীতিমালায় উত্তরাধিকার ও সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে জোর দেয়া হলেও ২০০৮ সালের নীতিমালা থেকে তা বাদ দেওয়া হয়েছে[১১]। ফোরাম আরো উল্লেখ করে, নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে ছিল আলোচনার মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতা সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন এবং পিআরএসপির জেন্ডার সংক্রান্ত দিক- নির্দেশনার পুনর্বিবেচনা[১২]।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগের বাস্তবায়ন

৮. অধিকার এবং এফআইডিএইচ উল্লেখ করে যে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিবেদন পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন, নির্যাতন বিরোধী চুক্তি কমিটিতে কোনো প্রতিবেদন দাখিল করেনি। এছাড়া মানবাধিকার কমিটি এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার কমিটির একটিতেও কোনো প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি। বর্ণবৈষম্য বিরোধী চুক্তির আওতায় তৃতীয় প্রতিবেদনটি এখনো বাকি রয়েছে। অধিকার এবং এফআইডিএইচ-এর মতানুযায়ী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন, কার্যপদ্ধতি ও তার ফলাফল পর্যালোচনার ব্যাপারে বাংলাদেশের ইতিহাস কখনোই আশাব্যঞ্জক নয়। তারা আরো উল্লেখ করে যে সিডও সনদের ওপর আরোপিত সংরক্ষণ তুলে নেয়াসহ নারীর প্রতি বৈষম্যের সংজ্ঞা নির্ধারন ও সার্বজনীন পারিবারিক আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত যে সব সুপারিশ ২০০৪ সালের সিডও কমিটি প্রদান করেছিল সেসব বিষয় এখনো অসম্পন্ন রয়েছে। একইভাবে বর্ণবৈষম্য বিরোধী ও শিমু অধিকার কমিটির সুপারিশসমূহও উপেক্ষিত হয়েছে।

৯. ফোরাম ব্যক্ত করেছে যে ২০০৩ সালের শিশু অধিকার কমিটির সুপারিশসমূহের প্রেক্ষিতে অপরাধী সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স সাত হতে নয় বছরে উন্নীত করা হয়েছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুযায়ী কর্মে নিয়োগের ব্যাপারে ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপ এখনো পর্যন্ত নেওয়া হয়নি কিংবা লিঙ্গ বৈষম্য ব্যতিরেকে নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে প্রণীত বর্তমান আইনের পরিমার্জন বা সংশোধন, শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ কিংবা একটি জাতীয় শরণার্থী আইন প্রণয়ন এবং ১৯৫১ সালের শরনার্থী বিষয়ক সনদ গ্রহণে কিংবা শিশুদের প্রতি সংবেদনশীল অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতি চালু করা হয়নি।

১০. কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) লক্ষ্য করেছে যে, সংক্ষিপ্ত বিচার ও বিচারবহির্ভূত উপায়ে শাস্তি কার্যকর সংক্রান্ত জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ারকে বাংলাদেশের পক্ষ হতে কখনো কোনো আমন্ত্রণ পাঠানো হয়নি[১৫]। বিডিইআরএম, নাগরিক উদ্যোগ, এবং আইডিএসএন-এর মতে, জাতিসংঘের এ ধরনের প্রতিনিধিদের এ দেশে আগমন সরকারকে মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের সাথে গঠনমূলক মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেবে যা দেশের মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা ও বাধাসমূহকে দূর করার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। বিশেষত সংখ্যালঘু বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি দলিতসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্য রোধ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে সমর্থ হবেন[১৬]।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়ন

১. সমতা এবং বৈষম্যহীনতা

১১. ফোরাম উল্লেখ করেছে যে, ধর্মকে ভিত্তি করে তৈরি আইনসমূহ, যেমন উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, শিশুর অভিভাবকত্ব এবং দত্তক - এগুলো নারীর প্রতি

বৈষম্যমূলক। নাগরিকত্ব আইনও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এবং সম্পদে ও সেবাপ্রাপ্তি বিশেষত স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে কার্যকরি সুযোগের অভাব, নারীর অধিকার প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই নারীরা বৈষম্যের মুখোমুখি হচ্ছে। সহিংসতা বাংলাদেশে নারীদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার একটি বিরাট অংশ[১৭]।

১২. বাংলাদেশ দলিত এন্ড এক্সক্লুডেড রাইটস্ মুভমেন্ট (বিডিইআরএম), নাগরিক উদ্যোগ (এনইউ) এন্ড দ্যা ইন্টারন্যাশনাল দলিত সলিডারিটি নেটওয়ার্ক (আইডিএসএন) উল্লেখ করেছে যে, দলিতদের বিরুদ্ধে বৈষম্য নিরসন এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে ও মানবাধিকার সুরক্ষায় সরকারের পক্ষ থেকে কোনোরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ দেখা যায়নি। দলিত নারীরা দ্বিগুন বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং এখনো তাদের পক্ষে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশ ও সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি সক্রিয় ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান যা দলিত সম্প্রদায়ের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার অধিকার ও সমান সুযোগের অধিকারকে প্রভাবিত করে। বিশেষত শিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগের অভাব একটি বড় বিষয়। এ ছাড়া রয়েছে দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বাসস্থান সমস্যা, কর্মক্ষেত্রে অসম সুযোগ, নারীদের প্রতি বৈষম্য, দাসশ্রম এবং শিশুশ্রম[১৮]।

১৩. বিডিইআরএম, নাগরিক উদ্যোগ এবং আইডিএসএন উল্লেখ করেছে যে দলিতদের তাদের নিজস্ব এলাকার বাইরে বসবাসের জন্য কোনো ঘর ভাড়া করতে বা গৃহ নির্মাণ করতে দেওয়া হয় না। দলিত নয় এমন কোনো সম্প্রদায়ের মন্দির বা ধর্মানুষ্ঠানে তাদের যেতে দেয়া হয় না। এমনকি চায়ের বা খাবারের দোকানে, কারো বাড়িতে, খেলার মাঠে, সিনেমা হলে, মৃতদের সৎকারের জায়গায় কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান বা সঙ্গীতানুষ্ঠানে বা কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দলিতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। দলিতরা কখনও কখনও চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়, যেমন অপহরণ, ধর্ষণ, অত্যাচার, বসতবাড়ী উচ্ছেদ ও ধ্বংস, জোরপূর্বক অবৈধভাবে জমির অধিকার হরণ, জমি হতে উচ্ছেদ, ভয়-ভীতি প্রদর্শন[১৯]।

১৪. এশিয়া ইনডিজেনাস পিপল্স প্যাক্ট ফাউন্ডেশনে (এআইপিপি) উল্লেখ করেছে, সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতি, গোষ্ঠী এবং জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনো ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ আছে। অথচ দেশের আদিবাসী গোষ্ঠীরা সামাজিক, জাতিগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগতভাবে বৈষম্যের শিকার[২০]। এআইপিপি উল্লেখ করেছে যে আদিবাসী নারীরা শুধুমাত্র নির্যাতন ও অবহেলারই শিকার নন, বরং তারা নিয়মিত ধর্ষণ, অপহরণ এবং হত্যারও শিকার হয়ে থাকে। নারীর এহেন মানবাধিকার লঙ্ঘন শুধুমাত্র গৃহ অভ্যন্তরে বা প্রকাশ্যেই ঘটে না, পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীনও তারা এ ধরনের ঘটনার শিকার হন[২১]।

১৫. হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য কাউন্সিল (বিএইচবিসিইউএস) উল্লেখ করেছে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নারীরা দ্বিগুন বেশী বিপদের সম্মুখীন হন এবং তাদের জাতিগত অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়। প্রচলিত অনেক আইন বা বিধি নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের সৃষ্টি করে। উপরন্তু প্রতিটি সরকারই সংখ্যালঘু নারীদের যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, বলপূর্বক

আটকাবস্থা ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ (বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারীদের ক্ষেত্রে) এর বিষয়গুলোতে চরম উদাসীনতা এবং উপেক্ষার পরিচয় দেয়। বৈষম্যের শিকার এসব নারীরা অপর্যাপ্ত আইনি নিরাপত্তা এবং অসহযোগিতা ছাড়াও প্রতিকার বা প্রতিবিধান এর ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের বিরূপ মনোভাবের সম্মুখীন হন[২২]।

১৬. এসোসিয়েশন অব ইয়াং জেনারেশন অব উর্দু স্পিকিং কমিউনিটি (এওয়াইজিইউএসসি) উল্লেখ করেছে যে, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সুযোগের অভাব বিহারী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা। বিহারী সম্প্রদায়ের জমি থেকে উৎখাত, বলপূর্বক জমির অধিকার হরণ এবং প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহতকরণ তাদের সমস্যাকে আরো ঘনীভূত করে। এওয়াইজিইউএসসি আরো উল্লেখ করেছে যে, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার মূলে রয়েছে সামাজিক বৈষম্য। বাসস্থানের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণে বিহারী সম্প্রদায়ের জন্য অবিলম্বে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা একটি জরুরি প্রয়োজন[২৪]।

১৭. ফোরাম বৈষম্যমূলক আইনের ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়োগের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, (যেমন ১৯২২ সালে প্রণীত উন্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ আইন, যা বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবে অক্ষম ও মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত করে)। এছাড়া মানুষের বিভিন্ন প্রতিবন্ধীত্বজনিত অবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের ধারণা ও মনোভাবের পরিবর্তন এবং তাদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিদ্যমান আইন ও ব্যবস্থা প্রয়োগের অভাবও ফোরামের উদ্বেগের কারণ। ফোরাম আরো উল্লেখ করেছে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা বা বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতাজনিত বৈষম্যের উপর একটি সঠিক জাতীয় উপাত্ত সংগ্রহের অভাবে এ ব্যাপারে কোনো গভীর বিশ্লেষণ বা লক্ষ্য অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন বিঘ্নিত হচ্ছে[২৫]।

২. *ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার*

১৮. এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস (এসিএইচআর) র‍্যাবের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অপরাধ দমনের জন্য ২০০২ এর মার্চ এ গঠিত র‍্যাব বাহিনী 'ক্রসফায়ার'- এর নামে ব্যাপকহারে বিচার বহির্ভূত হত্যার জন্য দায়ী। ২০০৭ সালে তথাকথিত এই ক্রসফায়ারে ১৮৪ জনের মৃত্যু ঘটেছে।

১৯. ফোরাম উল্লেখ করে যে, জরুরি অবস্থার আগে ও পরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক বিচার বহির্ভূত হত্যাসহ হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন এবং ধর্ষণের যে ধারাবাহিক তথ্য বা প্রতিবেদন পাওয়া যায়, তা বাংলাদেশের নাগরিকদের জীবনের অধিকারের ভঙ্গুরতা নির্দেশ করে। এই সকল হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার, শাস্তি এবং অনুসন্ধান কার্যক্রমের ব্যাপারে যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে কোনো ধরনের তথ্য প্রকাশে রাষ্ট্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বিশেষ করে চরমপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠীরা যে সব সহিংস আক্রমণের জন্য দায়ী এবং যেগুলোর কোনো সাজা হয়নি, সেগুলো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকারকে চরমভাবে খর্ব করে[২৭]।

২০. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (এআই) বলেছে যে বাংলাদেশকে অবশ্যই হেফাজতে মৃত্যু, অত্যাচার ও অন্যান্য দুর্ব্যবহার, বিচার বহির্ভূত হত্যা, ধর্ষণ এবং অন্যান্য ধরনের লিঙ্গ-

ভিত্তিক সহিংসতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক আইনের অপব্যবহার এবং দায়মুক্তির সুযোগ নিরসনের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে[২৮]। এআইটিপিএন অভিযোগ করেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর অব্যাহত উপস্থিতি এবং সামরিক ঘাটির সম্প্রসারণের ফলে তা বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডসহ ধারাবাহিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সহায়তা করছে। গ্রেফতারের পর সামরিক বাহিনীর হেফাজতে অত্যাচারে ফলে মৃত্যুর ঘটনাও প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে[২৯]।

২১. হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) উল্লেখ করে যে, ব্যক্তির জীবনের অধিকার, বিচারবহির্ভূত হত্যা থেকে কার্যকরী নিরাপত্তার অধিকার, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, অমানুষিক ও অমর্যাদাকর বা অবমাননাকর আচরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাধ্যবাধকতাগুলোর সমর্থনে বাংলাদেশের ব্যর্থতা লক্ষ্য করা গেছে। ফৌজদারী তদন্তের ক্ষেত্রে নির্যাতন একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা কর্তৃক হেফাজতে থাকা ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের জন্য অত্যাচারকে হাতিয়ার হিসাবে অহরহ ব্যবহার করা হয়[৩০]।

এএলআরসি অভিযোগ করেছে যে, নির্যাতনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় অর্থ আদায়, জোরপূর্বক ভূয়া স্বীকারোক্তি প্রদানে বাধ্য করা, এবং ক্ষমতাসীন দলের বিরোধী গোষ্ঠি দমনের জন্য। সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং গোয়েন্দা বিভাগসমূহের নিজস্ব 'নির্যাতন সেল' আছে এবং সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের নামে লোকজনকে নির্যাতন করা হয়[৩১]।

২২. ফোরাম উল্লেখ করে যে, অন্যায় গ্রেফতার ও আটকাদেশের মতো ঘটনাসহ বহুল প্রতিবেদিত গণগ্রেফতার এর ঘটনা ঘটেই চলেছে। জরুরি ক্ষমতা আইনের অধীনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গ্রেফতারি ক্ষমতাসহ গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার এবং জরুরি ক্ষমতা আইনের অধীনে প্রতীয়মান অপরাধের ক্ষেত্রে জামিনের উপর নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধ ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারকে চরমভাবে খর্ব করে। বিশেষত প্রান্তসীমায় অবস্থিত মানুষ বা দরিদ্র জনগণের উপর এর একটি ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে কারণ তারা প্রতিকার বা প্রতিবিধানকল্পে উচ্চ আদালতের দ্রুত নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আওতায় আসতে পারে না[৩২]। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল উল্লেখ করেছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিরোধমূলক আটকাদেশ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূতভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণের প্রচুর দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে যা আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী[৩৩]। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল উল্লেখ করেছে যে, ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর বলে প্রতীয়মান হবে তাদের আটকাদেশের ব্যবস্থা আছে এবং নির্বাহীগণ আদালতে তাদের কৃত কর্মের সত্যতা প্রমাণ ছাড়াই নিয়মবহির্ভূতভাবে যে কাউকে আটক করতে পারে[৩৪]।

২৩. এএলআরসি উল্লেখ করেছে যে, কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সময় গ্রেফতারি পরোয়ানা ও সংশ্লিষ্ট তথ্য কদাচিৎ উপস্থাপন করা হয়। গ্রেফতারের পর ব্যক্তির পক্ষে আইনগত পরামর্শের সুযোগ প্রায় ক্ষেত্রে খুব সুলভ নয়। পুলিশ স্টেশন বা মিলিটারি ক্যাম্পে যে সকল ব্যক্তি দিন, সপ্তাহ এমনকি মাসব্যাপী

আটকাধীন থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে কোনো তালিকা বা লেখ্য নথী এবং আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না[৩৬]।

২৪. অধিকার এবং এফআইডিএইচ উল্লেখ করেছে যে, কারাগারে যে সংখ্যক ব্যক্তিকে আটক রাখা হয়েছে তা স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতার অনেক উর্ধ্বে। গণগ্রেফতারের সময় সমস্যা অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছায় এবং তখন গ্রেফতারকৃতদের সাধারণ কারাগারে অত্যন্ত গাদাগাদি অবস্থায় থাকতে হয় যা কয়েদিদের অধিকারকে মারাত্মকভাবে লঙ্ঘন করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের ৬৮টি কারাগারে মোট কয়েদীর সংখ্যা ৮৭,৫৭৯ জন যা জেলাগুলোর মোট ধারণ ক্ষমতার (২৭,৩৬৮) তিনগুণেরও বেশি। এর ফলে খাদ্যের মৌলিক চাহিদা, স্বাস্থ্য, কয়েদীদের চিত্ত বিনোদন সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিদারুণভাবে অবহেলিত হয়[৩৭]।

২৫. অধিকার এবং এফআইডিএইচ এর মতানুযায়ী বাংলাদেশে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বিভিন্ন রূপ এবং ধরন বর্তমান। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধর্ষণ, শারীরিক প্রহার, অত্যাচার এবং হত্যা– পারিবারিক পরিমন্ডলে ও জনসমক্ষে। এর সাথে সম্পর্কিত প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিকতা, শ্রেণী বৈষম্য ও নারীর প্রতি পরিবার ও সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি[৩৮]। অধিকার ও এফআইডিএইচ উল্লেখ করেছে যে প্রায় সব ক'টি ঘটনাতেই সামাজিক কলঙ্ক বা ধর্ষণকারীর ভয়ে ধর্ষণের শিকার নারী এবং তার পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি প্রকাশ করতে চান না[৩৯]। সেজ্ঞাল রাইটস ইনিশিয়েটিভ (এসআরআই) উল্লেখ করে যে, হিজরা এবং অন্যান্য মেয়েলী পুরুষেরা প্রায়শই অপহরণ, অন্যায় আটক ও বন্দিদশা, প্রহার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও স্থানীয় অপরাধী কর্তৃক গণধর্ষণ ইত্যাদি জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে অরক্ষিত অবস্থায় জীবন ধারণ করে[৪০]। এসআরআই উল্লেখ করছে যে, পুরুষ দ্বারা পুরুষকে ধর্ষণের ক্ষেত্রে শাস্তিদানযোগ্য কোনো আইন নেই[৪১]।

২৬. ফোরাম উল্লেখ করছে যে, প্রযোজ্য আইনের আওতায় শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণের বয়সসীমা ১৪ হতে ১৮ বছর পর্যন্ত কিন্তু এর তেমন কার্যকরি বাস্তবায়ন নাই। বাস্তবতা হচ্ছে, দেশে প্রতি ৮ জন শিশুর ১ জন কর্মজীবী। বস্তি এবং আদিবাসী এলাকায় প্রায় এক-পঞ্চমাংশ শিশু তাদের নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য শিশু শ্রমে নিয়োজিত। শিশু শ্রমে নিয়োজিত এক-চতুর্থাংশ শিশুর স্কুলে যাওয়া হয় না। ৫ এবং ১৪ বছরের মধ্যে প্রায় ৬৬ মিলিয়ন শিশু দেশের শ্রমশক্তির সাথে জড়িত।

৩. বিচার প্রশাসন, দায়মুক্তি এবং আইনের শাসন

২৭. এএলআরসি মনে করে যে, ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে কাজ করবেন এমনটি নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে নিু পর্যায়ের বিচার বিভাগকে দুর্বল ও বিশ্বাসযোগ্যহীন করে ফেলা হয়েছে[৪৩]। অধিকার ও এফআইডিএইচ মনে করে যে, সরকারের ক্রমাগত হস্তক্ষেপের কারণে বিচার বিভাগ গভীর সংকটে উপনীত, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এ দু'টিকে পৃথক করা হয়েছে। বিচার বিভাগের দুর্বলতা ন্যায় বিচার ও মানবাধিকার লংঘনের সংকটকে স্থায়ীত্ব দান করে[৪৪]। ফোরাম উল্লেখ করেছে যে, জরুরি আইন-প্রবিধান-এর আওতায়

সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা আইনানুযায়ী এবং বাস্তবিক উভয়ভাবেই ব্যাপক খর্ব করা হয়।

২৮. সিএইচআরআই বিবৃত করেছে যে, বাংলাদেশে পুলিশ কার্যক্রম সংস্কার করা হয়নি এবং তা এখনো অপ্রচলিত এবং সেকেলে নিয়ম দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত। পুলিশ বাহিনীকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয় তা হচ্ছে তারা সামাজিক এবং রাজনৈতিক অসন্তোষ বা বিক্ষোভ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এবং নারীর প্রতি অপরাধ দমনে ব্যর্থ। দুর্বল কর্ম পরিবেশ এবং পশ্চাৎপদ ও সেকেলে ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রভৃতির ফলে জনমনে পুলিশ সম্বন্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে[৪৬]। সিএইচআরআই বলেছে যে ২০০৬ সালে পুলিশ সংস্কারের জন্য একটি রূপরেখা বা প্রোগ্রামের কাজ প্রথম আরম্ভ করা হয়েছিল। উপনিবেশিক যুগের পুলিশ আইন প্রতিস্থাপনের জন্য ২০০৭ সালে প্রস্তাবিত একটি খসড়া তৈরি সম্পূর্ণ হয় এবং নাগরিক সমাজের নিকট মতামতের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। নাগরিকদের মতামত সন্নিবেশ করে বিলটি এখন স্বরাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রয়েছে[৪৭]। এলআরসি উল্লেখ করে যে, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধি এবং পুলিশ সহযোগে একটি নতুন যৌথবাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে আইন প্রয়োগ প্রক্রিয়ার সামরিকীকরণ বাস্তবায়িত হয়েছে। আদালতকে সেনা হস্তক্ষেপ বরদাশত করতে হয়[৪৮]।

২৯. হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে যে, দায়মুক্তি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সমস্যা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মান্ধাতার আমলের আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে যা বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনি মানদণ্ডের সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়[৪৯]। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মন্তব্য করেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক সংস্কারের অঙ্গীকার মানবাধিকার সুরক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তথাপি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত রাখার জন্য সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে দায়মুক্তির অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে।[৫০]

এআইটিপিএন বলেছে, সাধারণভাবে সব মানবাধিকারকর্মীকেই নজরদারির মধ্যে কাজ করতে হলেও বিশেষ করে আদিবাসী বা আদিবাসীদের নিয়ে কর্মরত মানবাধিকারকর্মীদের অধিক মাত্রায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হতে হয়।[৫১]

৪. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, বিবাহ এবং পারিবারিক জীবনের অংশগ্রহণের অধিকার

৩০. এসআরআই বর্ণনা করেছে যে, ফৌজদারী আইনের ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ যৌনপ্রবৃত্তিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে আইনের আওতায় এ জাতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড এবং সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। এসআরআই লক্ষ করেছে, যদিও এই আইনের আওতায় কোনো মামলা রুজু হয়নি কিংবা কোনো মামলার বিচার হয়নি, তথাপিও ৩৭৭ ধারা বহাল রাখা হয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক হিজড়া, কথি এবং সমকামী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে উৎপীড়নের জন্য[৫২]।

৫. ধর্ম বা বিশ্বাস, মত প্রকাশ, সংগঠন এবং শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণের অধিকার।

৩১. বেকেট ফান্ড উল্লেখ করেছে যে, আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা চরমপন্থী ইসলামী গোষ্ঠীর দ্বারা ব্যাপকভাবে নিপীড়িত হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের মসজিদ এবং গৃহ ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। কিছু সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকের মতে, নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিলেও আহমদীয়ারা কিছু বিতর্কিত বিশ্বাস লালন করে। ২০০৪ সালে সরকার কর্তৃক আহমেদিয়াদের প্রকাশনার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় আদালত তার বিরুদ্ধে রায় দেয়। সরকার সে রায় মেনে চলছে এবং আহমাদিয়া সম্প্রদায়ের রক্ষাকল্পে সরকার তাদের জন্য অধিকতর নিরাপত্তা প্রদানের পদক্ষেপ নিয়েছে। তথাপি আহমাদিয়া বিরোধী সহিংসতা এবং বৈষম্য বাংলাদেশের ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটি বড় উদ্বেগের বিষয়[৫৩]।

৩২. এআইটিপিএন বিধৃত করেছে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীরা প্রায়শই হয়রানি এবং আক্রমণের শিকার হয়েছেন এবং বৌদ্ধ মন্দিরগুলো লুণ্ঠন এবং ধ্বংস করা হয়েছিল।[৫৪]

৩৩. বিএইচবিসিইউসি জানিয়েছে যে জরুরি ক্ষমতা আইন ২০০৭ এখনো কার্যকরী এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে এর প্রত্যাহারের সম্ভাবনা কম (নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০০৮ এ এটি অনুষ্ঠিত হবে)[৫৫]। ফোরাম উল্লেখ করছে যে, জরুরি ক্ষমতা আইনের শর্ত অনুযায়ী মত প্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত। প্রকাশ যে, সরকার গোপনে ভীতি প্রদর্শনের যে নীতি অবলম্বন করেছিল তার পরিণতি হিসেবে মুদ্রন ও প্রচার মাধ্যম ব্যাপক আত্ম-নিয়ন্ত্রন আরোপ করে[৫৬]। রিপোর্টারস্ উইদাউট বর্ডারস্ উল্লেখ করে যে, সরকার এবং সামরিক প্রশাসন ক্রান্তিকালীন সময়ে গণমাধ্যমকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রন করে। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার অফিসাররা সম্পাদকদের সাথে বৈঠক করেন এবং নির্দেশ অমান্যের ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা অধ্যাদেশের ৫ অনুচ্ছেদসহ উপনিবেশিক ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দেন[৫৭]।

৩৪. ফোরাম উল্লেখ করে, জরুরি অবস্থার সময় যখন একদিকে কয়েকটি এনজিও বিভিন্ন ধরনের ভীতি প্রদর্শনের সম্মুখীন হতে থাকে, তেমনি অন্যান্যরা সরাসরি হস্তক্ষেপের শিকার হন যার মধ্যে ছিল নিয়ম বহির্ভূত গ্রেফতার এবং আটকাদেশসহ তাদের ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতারের ভীতি প্রদর্শন। ফোরাম আরো বলে, সকল ধরনের সমাবেশ বা পারস্পরিক যোগাযোগের অধিকার ক্রমাগতভাবে সংকীর্ণ করে ফেলা হয় এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক সহিংসতার ব্যবহার এবং ভীতি প্রদর্শন ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কর্মীদের প্রতিবাদ থামিয়ে দেবার ঘটনাও ঘটেছে। জরুরি অবস্থার সময়ে জনসভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় তা শ্রমিক অধিকার আদায়ের পরিবেশকে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অধিক ব্যাহত করে।[৫৮]

৩৫. এসিএইচআর বর্ণনা করে যে, মানবাধিকার কর্মীরা নজরদারির আওতায় থাকেন এবং যে সকল আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য কাজ করেন বা এই সকল সম্প্রদায়ের সাথে যাারা কাজ করেন তাদের বিভিন্ন ধরনের নিগ্রহের শিকার হতে হয়[৫৯]।

৬. কর্মের অধিকার ও ন্যায্য ও অনুকূল কাজের পরিবেশ

৩৬. ফোরাম উল্লেখ করে যে শিল্প খাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে প্রচলিত ধরন হচ্ছে চাকরিতে যোগদানের নিয়োগপত্র না দেয়া, পারিশ্রমিক বা বেতন প্রদানে বিলম্ব বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্মসময়ের অতিরিক্ত শ্রমঘন্টার পারিশ্রমিক প্রদানে ব্যর্থতা বা গরিমসি করা, কর্মজীবী নারীর মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান না করা এবং কর্মে থাকাকালীন সন্তানের দেখাশোনা বা পরিচর্যার প্রয়োজনীয় সুযোগের অভাব। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মালিকের অবহেলার কারণে বেশ ক'টি হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।[৬০]

৩৭. এওয়াইজিইউএসসি-এর মত অনুযায়ী চাকরিক্ষেত্রে সমান সুযোগের অধিকার না থাকা বিহারী সম্প্রদায়ের একটি বহুল আলোচিত সমস্যা। শুধুমাত্র সরকারি পদের ক্ষেত্রেই তারা বঞ্চিত নয়, বরং তাদের ক্যাম্পের ঠিকানা থাকায় এবং নাগরিকত্ব সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় চাকরি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হতে হয় যা একটি ব্যাপক উদ্বেগের কারণ[৬১]।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা এবং পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন জীবনযাপনের অধিকার

৩৮. বিডিইআরএম, নাগরিক উদ্যোগ এবং আইডিএসএন উল্লেখ করে যে নিম্নোক্ত সম্প্রদায়গুলো প্রথম পিআরএসপি তৈরির প্রক্রিয়ায় বাদ পড়েছিল– বাওয়ালী (কাঠুরে বা বনাঞ্চলে যারা বসবাস করে), মাওয়ালি (মধু সংগ্রহকারী), দলিত (ঝাড়ুদার, নর্দমা পরিস্কারক), ময়মাল (জেলে বা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে যারা) এবং মুচি (জুতা মেরামতকারি)। যদিও শেষ পিআরএসপি যাকে 'সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন' নামে অভিহিত করা হয়েছে, তাতে সুস্পষ্টভাবে দলিতদের কথা উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু এটি তৈরির প্রক্রিয়া যথেষ্ট নিয়মতান্ত্রিক ছিল এবং এটি সত্যিকার অর্থেই নাগরিক সমাজ থেকে মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে[৬২]। এআইটিপিএন উল্লেখ করে যে, আদিবাসীদেরকে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে ক্রমাগত বাইরেই রাখা হয়েছে।[৬৩]

৩৯. উবিনীগ উদ্বেগ প্রকাশ করে যে নাগরিকদের জন্য যথার্থ পরিমাণে খাদ্য মজুত এবং তাদের পুষ্টি নিশ্চিতকরণে সরকারের ক্রমাগত ব্যর্থতা আশঙ্কাজনক অবস্থায় উপনীত হয়েছে।[৬৪] উবিনীগ মনে করে যেহেতু বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টির অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে আইনী ব্যবস্থা, নীতি বা কর্মপন্থা কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, তাই দেশটির অবস্থা অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ।[৬৫] উবিনীগ আরও উল্লেখ করে যে, খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত মানবাধিকারের বিষয়গুলো পরিবেশ, জীব বৈচিত্র ও বংশানুগতি বিষয়ক জ্ঞান বা সম্পদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি বা অঙ্গীকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।[৬৬]

৪০. এসআরআই উল্লেখ করেছে যে হিজড়া সম্প্রদায়ের মাঝে প্রথাগত নপুংসকরণের যে আচার প্রচলিত আছে তা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে কারণ এই ধরনের চর্চাসমূহ বিশেষ ধরণের অস্ত্র দ্বারা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সম্পাদিত হয়ে থাকে।[৬৭]

৪১. ফোরাম উল্লেখ করেছে যে, বিদ্যমান সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী সকল জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির বিরুদ্ধে কথা বলা হলেও এবং এধরনের ক্ষেত্রে যথাযথ বিজ্ঞপ্তি এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য উচ্চ আদালত কর্তৃক সরকারের প্রতি নির্দেশ জারি হলেও প্রতিবছরই নিয়মিতভাবে বস্তি উচ্ছেদ বা ধ্বংসের ঘটনা ঘটেই চলছে।[৬৮]

৪২. এওয়াইজিইউএসসি অভিযোগ করেছে যে বাংলাদেশ সরকার উর্দুভাষাভাষী বিহারীদেরকে বাংলাদেশী নাগরিক কিংবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করে না। বিহারী ক্যাম্পে বসবাসরত বাসিন্দারা পিআরএসপির আওতাধীন নয়।[৬৯]

৮. শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার

৪৩. এওয়াইজিইউএসসি কর্তৃক বিধৃত হয়েছে যে, যদিও বিহারী শিশুদের সরকারি স্কুলে অধ্যয়ন বা ভর্তির ব্যাপারে কোনো আনুষ্ঠানিক সরকারি নিষেধাজ্ঞা নেই, কিন্তু ক্যাম্পে বসবাস করায় বা ক্যাম্পের ঠিকানা উল্লেখ করায় তাদের ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। যদিও এই বিষয়গুলোর পরিবর্তন হচ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিষয়গুলোর হেরফের ঘটে, কিন্তু মূলত স্কুলের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির মানসিকতার উপর নির্ভর করে ভর্তির ব্যাপারটি। এওয়াইজিইউএসসি আরো উল্লেখ করেছে যে, সাংবিধানিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তাদের ভাষা শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই এবং উর্দু সংস্কৃতি চর্চারও কোনো সুযোগ নেই।[৭০] বিডিইআরএম, নাগরিক উদ্যোগ এবং আইডিএসএন উল্লেখ করেছে অধিকাংশ দলিতেরই কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।[৭১]

৪৪. ফোরাম উল্লেখ করেছে যে, মূলধারায় শিক্ষা গ্রহণের অভাবের কারণে ৯৬ শতাংশ শারীরীক প্রতিবন্ধী শিশুর জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিদ্যমান আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভবন নির্মাণ না করায় যে কোনো ভবনে প্রতিবন্ধীদের অভিগম্যতা একটি গুরুতর সমস্য।[৭২]

৪৫. এসআরআই উল্লেখ করেছে যে, অধিকাংশ স্কুলগামী হিজড়া এবং কোথি বলে পরিচিতরা ভীতি, পীড়ন এবং মানসিক যন্ত্রণার বা অত্যাচারের শিকার হন এবং সরকারি প্রাইমারী স্কুল পরিত্যাগের পেছনে এই বিষয়গুলো বড় কারণ। আত্মহত্যা বা মানসিক আঘাতের ফলে সৃষ্ট মানসিক বিপর্যয়ের ঘটনাও ঘটে প্রচুর।[৭৩]

৯. সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠি

৪৬. এআইটিপিএন-এর মত অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টি আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস যাদের কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশে এই সকল নৃগোষ্ঠী নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু অবস্থানের কারণে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিকভাবে সবচাইতে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। সরকার কর্তৃক এই সকল সম্প্রদায়ের ভূমি দখল প্রক্রিয়া চলে রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে এবং মূলধারার বাঙালি গোষ্ঠি কর্তৃক এই ধরনের দখল প্রক্রিয়াকে সরকার ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে এবং উৎসাহ প্রদান করে। বাঙ্গালীরা এক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করে যেমন নকল দলিল তৈরি এবং জোরপূর্বক আদিবাসীদের জমি হতে উৎখাত। এআইটিপিএন-এর মতে জমি দখল পার্বত্য চট্রগ্রামের একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। জরুরী অবস্থা চালুর পর সামরিক বাহিনী সমতলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপনের বিষয়টি নবায়ন করেছে।[৭৭]

৪৭. আনরিপ্রেজেন্টেড নেশনস এন্ড পিপল্‌স অর্গানাইজেশন (ইউএনপিও) কর্তৃক বর্ণিত যে, পার্বত্য শান্তিচুক্তি একটি দীর্ঘ স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং স্থানীয় জুম্ম আদিবাসীদের শান্তি নিশ্চিতকল্পে আদতেই একটি রাজনৈতিক ইচ্ছার

বাস্তবায়ন[৭৮]। এআইপিপি উল্লেখ করেছে যে, পার্বত্য শান্তিচুক্তি একটি ভূমি কমিশন গঠনে সহায়ক হয়েছে যা দ্বারা দীর্ঘদিনের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধসমূহ প্রচলিত আইন, প্রথা ও বিদ্যমান আচার বা রীতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে। কমিশনের কাজ এখনো আরম্ভ হয়নি। ফলে চুক্তি সম্পাদনের ১১ বছর পরও ভূমি সংক্রান্ত বিবাদেরও মীমাংসা হয়নি।[৭৯]

৪৮. এসিএইচআর উল্লেখ করেছে যে, হিন্দু সংখ্যালঘুরা লাগাতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছেন এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হচ্ছে। প্রতিবেদিত হয়েছে যে ২৭ লক্ষ হিন্দু পরিবারের ৪৪ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১২ লক্ষ হিন্দুই শত্রু সম্পত্তি আইন ১৯৬৫ এবং অর্পিত সম্পত্তি আইন ১৯৭৪-এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই আইন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা এবং তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে।

১০. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ

৪৯. এআইটিপিএন উল্লেখ করেছে যে, অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের অবস্থান মূলত পার্বত্য জেলাগুলোতে যার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।[৮১] এআইটিপিএন উল্লেখ করেছে যে, যদিও তাদেরকে কোনো পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কিংবা খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পয়নিষ্কাশন, নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করা হয়নি, কিন্তু অবৈধ বসবাসকারী পরিবারসমূহকে ১৯৭৮ সাল থেকে বিনামূল্যে রেশনসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।৮২ এআইটিপিএন অভিযোগ করেছে যে, 'পরিবেশ উদ্যান' বা ইকো পার্ক তৈরির নামে বিভিন্ন সরকার বনাঞ্চলসমূহের ক্রমাগত ধ্বংস সাধন করেছে এবং মধুপুর ও টাঙ্গাইল জেলার ২৫ হাজার গারো এবং কোচ আদিবাসীকে স্থানচ্যুত করা হয়েছে। যে সকল আদিবাসী এই ইকো পার্ক-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

১১. মানবাধিকার ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ

৫০. অধিকার এবং এফআইডিএইচ উল্লেখ করে যে, সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ ২০০৮ জনমানুষের সাথে কোনো আলোচনা ছাড়াই ঘোষিত হয় এবং এটি মানবাধিকার পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে ভূমিকা রাখে। এই আইনে বাংলাদেশের ঐক্য, সম্প্রীতি, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য ক্ষতিকর অজুহাতে ঢালাওভাবে সব কর্মকান্ডকে সন্ত্রাস হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এর দ্বারা কেবল সন্দেহের বশেই যে কোনো ব্যক্তিকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করে অভিযুক্ত করা যায়। একবার গ্রেফতার হলে, আদালত তার জামিন মঞ্জুর করতে পারে না।[৮৪]

৩. অর্জন, ইতিবাচক দৃষ্টান্ত, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

৫১. উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী ক্যাম্পের অধিবাসীদেরকে বাংলাদেশী হিসেবে বিবেচনা করে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও ভোটার তালিকায় নাম উঠানোর ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে এওয়াইজিইউএসসি স্বাগত জানিয়েছে। এর ফলে অধিকাংশ ক্যাম্পবাসী জাতীয় পরিচয় পত্র পেয়েছে ও ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম উঠানোই তাদের জন্য যথেষ্ট নয়।[৮৫]

৫২. সিএইচআরআই উল্লেখ করে যে, সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ সালের এপ্রিলে ঘোষণা করে যা একটি ইতিবাচক অর্জন। এতে রাজনৈতিক দলে নারীদের এক-তৃতীয়াংশ অংশগ্রহণের পাশাপশি অর্জিত সম্পত্তিতে নারীর সমান নিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন আইন ও কোটা চালুর কথা বলা হয়েছে।[৮৬]

৫৩. ফোরাম উল্লেখ করেছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এর মধ্যে আছে বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও বিভাগে ৪৬টি ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুর্নগঠন, ভোটার হিসাবে তাদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করা।[৮৭]

৪. মূল জাতীয় অগ্রাধিকার, উদ্যোগ ও প্রতিশ্রুতি

প্রযোজ্য নয়

৫. সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কারিগরী সহায়তা

৫৪. বিডিইআরএম, নাগরিক উদ্যোগ ও আইডিএসএন সুপারিশ করে যে, দলিত জনগোষ্ঠির মানবাধিকার সুরক্ষায় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে অবশ্যই কারিগরি সহযোগিতা ও সুনির্দিষ্ট আইনগত উদ্যোগ নিতে হবে।[৮৮]

৫৫. এআইটিপিএন সুপারিশ করেছে যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠি বিষয়ক জাতীয় কমিশন গঠনে কারিগরি সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।[৮৯]

দ্রষ্টব্য:

আলোচ্য প্রবন্ধে নিম্নলিখিত উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া www.ohchr.org থেকেও তথ্য পাওয়া যাবে।

সুশীল সমাজ

ACHR: এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস, নয়া দিল্লী, ভারত।

AI: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, যুক্তরাজ্য।

AIPP: এশিয়া ইন্ডিজেনাস পিপলস্ প্যাক্ট ফাউন্ডেশন, চিয়াং মাই, থাইল্যান্ড।

AITPN: এশিয়ান ইন্ডিজেনাস এন্ড ট্রাইবাল পিপলস্ নেটওয়ার্ক, নয়া দিল্লী , ভারত।

ALRC: এশিয়ান লিগ্যাল রিসোর্স সেন্টার, হংকং, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ।

AYGUSC: এ্যাসোশিয়েশন অব ইয়াং জেনারেশান অব উর্দু স্পিকিং কমিউনিটি, বাংলাদেশ।

BDERM, NU I IDSN: বাংলাদেশ দলিত এন্ড এক্সক্লুডেড রাইটস্ মুভমেন্ট, নাগরিক উদ্যোগ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল দলিত সলিডারিটি নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ, যৌথ উপস্থাপনা।

BF: দ্যা বিকেট ফান্ড, ইউ এস এ।

BHBCUC: হিন্দু বুদ্ধিষ্ট ক্রিশ্চিয়ান ইউনিটি কাউন্সিল, অন্টারিও, কানাডা।

CHRI: কমনওয়েলথ্ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ।

HRW: হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ, নিউ ইয়র্ক, ইউনাইটেড স্টেট অব আমেরিকা।

ODHIKAR I FIDH: অধিকার ও ফেডারেশান ইন্টারন্যাশনেল দেঁজ লীগুইস দেঁজ ড্রয়েঁটস্ দে আই'হোম্মে, প্যারিস, ফ্রান্স, যৌথ উপস্থাপনা।

RBW: রিপোটার্স উইদাউট বর্ডারস্ প্যারিস, ফ্রান্স।

Forum: হিউম্যান রাইটস্ ফোরাম অন ইউ পি আর, বাংলাদেশ (দ্যা ফোরাম), বাংলাদেশ যা নিম্নোক্ত সদস্য সংগঠনগুলো দ্বারা গঠিত:

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), সচিবালয়;

এসিড সারভাইভারস্ ফাউন্ডেশান (এএসএফ);

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (বিএমপি);

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিস (বিলস্);

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস্ ট্রাস্ট (ব্লাস্ট);

বাংলাদেশ দলিত এন্ড এক্সক্লুডেড রাইটস্ মুভমেন্ট (বিডিইআরএম);

সেন্টার ফর রিহ্যাবিলাইটেশান অব টর্চার সারভাইভারস্ (সিআরটিএস);

ডি.নেট (ডেভলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক);

কর্মজীবী নারী;

নাগরিক উদ্যোগ;

নারী উদ্যোগ কেন্দ্র;

নিজেরা করি;

নারী পক্ষ;

ন্যাশনাল ফোরাম অব অরগানাইজেশানস্ ওয়ার্কিং উইথ দ্যা ডিস্যাবল্ (এনএফওডব্লিউডি);

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কালেক্টিভ (আরডিসি);

স্টেপস্ টুওয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট (স্টেপস্); এবং

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), যৌথ উপস্থাপনা

SRI: সেক্সচুয়াল রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ, মুলাবি এবং স্পেস ফর সেক্সচুয়ালিটিস এন্ড রাইটস্, ল্যাটিন আমেরিকা'র সমন্বয়ে গঠিত।

এ্যকশন কানাডা ফর পপুলেশান এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ক্রিয়েটিং রিসোর্সেস ফর এমপাওয়ারমেন্ট, এ্যকশন ইন্ডিয়া ও অন্যান্য সংগঠনের যৌথ উদ্যোগ।

উবিনীগ (পলিসি রিসার্স ফর ডেভেলপ অলটারনেটিভ), বাংলাদেশ।

UNPO: আনরিপ্রেজেন্টেড ন্যাশনস্ এন্ড পিপলস্ অরগানাইজেশান।

২. অধিকার, বাংলাদেশ এবং ফেডারেশান ইন্টারন্যাশনেল দেঁজ লীগুইস দেঁজ ড্রয়েঁটস্ দে আই'হোম্মে (এফআইডিএইচ) প্যারিস, ফ্রান্স-র উপস্থাপনা। পৃ.৪

৩. এশিয়ান ইন্ডিজিনাস এন্ড ট্রাইবাল পিপলস্ নেটওয়ার্ক (এআইটিপিএন), নিউ দিল্লী, ভারত। পৃ.১১

৪. দ্য হিউম্যান রাইটস্ ফোরাম অন ইউ পি আর, বাংলাদেশ (ফোরাম), বাংলাদেশ।

৫. অধিকার এন্ড এফআইডিএইচ। পৃ.১

৬. অ্যামন্যাস্টি ইন্টারন্যাশনাল (এআই), লন্ডন, ইউ কে। পৃ.১; প্যা.১

৭. দ্যা ফোরাম,প্যা.৭। পুন: দ্রষ্টব্য: সেক্সচুয়াল রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ, মুলাবি এবং স্পেস ফর সেক্সুয়ালিটিস এন্ড রাইটস্, ল্যাটিন আমেরিকা- র সমন্বয়ে গঠিত। একশান কানাডা ফর পপুলেশান এন্ড ডেভেলপমেন্ট , ক্রিয়েটিং রিসোর্সেস ফর এমপাওয়ারমেন্ট , একশান ইন্ডিয়া ও অন্যান্য সংগঠনের যৌথ উদ্যোগ, প্যা.৭ এবং এশিয়ান লিগ্যাল রিসোর্স সেন্টার (এ এল আর সি), হংকং, পিপলস্ রিপাবলিক অব চায়না। প্যা.১

৮. দ্যা ফোরাম,প্যা.৫; এসআরআই প্যা.৪ পুণ: দ্রষ্টব্য।

৯. দ্যা ফোরাম,প্যা.১৬ পুণ:দ্রষ্টব্য: হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ, নিউ ইয়র্ক, ইউএস, পৃ.২ এবং এসআরআই প্যা. ৫

১০. বাংলাদেশ দলিত এন্ড এক্সক্লুডেড রাইটস্ মুভমেন্ট (বিডিইআরএম), নাগরিক উদ্যোগ (এনইউ) এন্ড দ্যা ইন্টারন্যাশনাল দলিত সলিডারিটি নেটওয়ার্ক (আইডিএসএন), বাংলাদেশ, যৌথ উপস্থাপনা; প্যা. ১১।

১১. দ্যা ফোরাম:প্যা.১১ ও ১২।

১২. দ্যা ফোরাম:প্যা.৩৬, এসআরআই,প্যা.২ পুণ:দ্রষ্টব্য।

১৩. অধিকার এন্ড এফঅইডিএইচ। পৃ.৫

১৪. দ্যা ফোরাম;প্যা.৬০

১৫. কমনওয়েলথ্ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই), লন্ডন, ইউ কে। প্যা.১৩

১৬. বিডিইআরএম, এনইউ এবংআইডিএসএন। প্যা.১৫

১৭. দ্যা ফোরাম,প্যা.৩৫

১৮. বিডিইআরএম, এনইউ এবংআইডিএসএন। প্যা.১৬ ও ১৭

১৯. বিডিইআরএম, এনইউ এবংআইডিএসএন। প্যা.১০ ২০.এশিয়া ইন্ডিজেনাস পিপলস্ প্যাক্ট ফাউন্ডেশন (এ আই পি পি), চিয়াং মাই, থাইল্যান্ড. পৃ.১; প্যা.৫

২১. এআইপিপি. পৃ৪; প্যা.২০

২২. হিন্দু বুদ্ধিষ্ট ক্রিশ্চিয়ান ইউনিটি কাউন্সিল(বিএইচবিসিইউসি, অন্টারিও), অন্টারিও, কানাডা। পৃ.২

২৩. এ্যসোশিয়েশান অব ইয়াং জেনারেশান অব উর্দু স্পিকিং কমিউনিটি (এওয়াইজিইউএসসি), বাংলাদেশ। পৃ.৩

২৪. অধিকার। পৃ.৪ ও ৫

২৫. দ্যা ফোরাম, প্যা.৫৫

২৬. এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস্ (এসিএইচআর), নিউ দিল্লী, ভারত। পৃ.১, প্যা.৪, পুণ:দ্রষ্টব্য- পৃ.৬, প্যা.২৩; এআইপিপি, পৃ.২,প্যা.৭; সিএইচআরআই,প্যা.১১ ও ১২; এইচআরডব্লিউ, পৃ.২ ও ৩ এবং অধিকার এন্ড এফঅইডিএইচ, পৃ.২

২৭. দ্যা ফোরাম,প্যা.২০ ও ২১

২৮. এআই, পৃ. ৩; প্যা.৫

২৯. এআইটিপিএন, পৃ.৭

৩০. এইচআরডব্লিউ, পৃ.১; পুণ:দ্রষ্টব্য-এআই , পৃ.৫, প্যা.১২ ও ১৫; সিএইচআরআই প্যা.৩ এবং অধিকার এন্ড এফঅইডিএইচ, পৃ.২

৩১. এএলআরসি, প্যা.১৪; পুণ:দ্রষ্টব্য-এআইটিপিএন, পৃ.৭; সিএইচআরআই, প্যা.৯ এবং অধিকার এন্ড এফঅইডিএইচ, পৃ.২

৩২. দ্যা ফোরাম,প্যা.২৩

৩৩. এআই, পৃ.৪ , প্যা. ৬

৩৪. এআই, পৃ.৪ , প্যা. ৯ ও ১০

৩৫. এআই, পৃ.৪, প্যা.১১

৩৬. এএলআরসি, প্যা. ১৩

৩৭. অধিকার এন্ড এফঅইডিএইচ, পৃ.২

৩৮. অধিকার এন্ড এফঅইডিএইচ, পৃ.২

৩৯. অধিকার এন্ড এফঅইডিএইচ, পৃ.৩; পুণ:দ্রষ্টব্য- এআইটিপিএন, পৃ.৮ এবং সিএইচআরআই প্যা.২২

৪০. সেক্সচুয়াল রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (এসআরআই), প্যা.১৭

৪১. এসআরআই, প্যা.১৫

৪২. দ্যা ফোরাম,প্যা.৩৭

৪৩. এএলআরসি, প্যা. ২

৪৪. অধিকার এন্ড এফঅইডিএইচ, পৃ.৪

৪৫. দ্যা ফোরাম,প্যা.১৪

৪৬. সিএইচআরআই, প্যা.১৪; পুণ:দ্রষ্টব্য- ওডিএইচআইকেএআর এন্ড এফঅইডিএইচ, পৃ.৩

৪৭. সিএইচআরআই, প্যা.১৬

৪৮. এএলআরসি, প্যা.৭

৪৯. এইচআরডব্লিউ, পৃ.৩; পুণ:দ্রষ্টব্য- দ্যা ফোরাম,প্যা.১৯

৫০. এআই,পৃ ৬; প্যা.১৯

৫১. এআইটিপিএন, পৃ.১০

৫২. এসআরআই, প্যা.১২ ও ১৩

৫৩. দ্যা বীকেট ফান্ড, পৃ.৪; পুণ:দ্রষ্টব্য- ওডিএইচআইকেএআর এন্ড এফঅইডিএইচ, পৃ.৩

৫৪. এআইটিপিএন, পৃ.৮; পুণ:দ্রষ্টব্য- আনরিপ্রেজেন্টেড ন্যাশনস্ এন্ড পিপলস্ অরগানাইজেশানস্ (ইউএনপিও), পৃ.৩-৪।

৫৫. বিএইচবিসিইউসি, অন্টারিও; পৃ.১

৫৬. দ্যা ফোরাম,প্যা.২৫

৫৭. রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস্ (আরবিডব্লিউ), পৃ.১ প্যারিস , ফ্রান্স; ; পুণ:দ্রষ্টব্য-এসিএউচআর, পৃ.১, প্যা.৭; এএলআরসি, প্যা.১৯; অধিকার এন্ড এফঅইডিএইচ, পৃ.৩

৫৮. দ্যা ফোরাম,প্যা.৪১

৫৯. এসিএইচআর, পৃ.১, প্যা.১০

৬০. দ্যা ফোরাম,প্যা.৪১

৬১. এওয়াইজিইউএসসি, পৃ.৪; পুণ:দ্রষ্টব্য- বিডিইআরএম,এনইউ এবং আইডিএসএন, প্যা.১৯ ও ২০

৬২. বিডিইআরএম, এনইউ এবং আইডিএসএন, প্যা.৭

৬৩. এআইটিপিএন, পৃ.৪

৬৪. উবিনীগ (পলিসি রিসার্চ ফর ডেভেলপ অলটারনেটিভ), পৃ.১

৬৫. উবিনীগ, পৃ.১

৬৬. উবিনীগ, পৃ.৪

৬৭. এসআরআই, প্যা.১৮ ৬৮.দ্যা ফোরাম,প্যা.৩৩

৬৯. এওয়াইজিইউএসসি, পৃ.৩; পুণ:দ্রষ্টব্য- দ্যা ফোরাম,প্যা.৪৫

৭০. এওয়াইজিইউএসসি, পৃ৪

৭১. বিডিইআরএম, এনইউ এবং আইডিএসএন, প্যা.১৮

৭২. দ্যা ফোরাম,প্যা.৫৭

৭৩. এসআরআই, প্যা.১৭

৭৪. এআইটিপিএন, পৃ.২

৭৫. এআইপিপি,পৃ ১; প্যা.১; পুণ:দ্রষ্টব্য- সিএইচআরআই, প্যা.১৭; বিডিইআরএম, এনইউ এবং আইডিএসএন, প্যা.৯ এবং দ্যা ফোরাম,প্যা.৫৩ ও ৫৪

৭৬. এআইটিপিএন, পৃ.২

৭৭. এআইটিপিএন, পৃ.৬; পুণ:দ্রষ্টব্য- দ্যা ফোরাম,প্যা.৪৬-৫০

৭৮. ইউএনপিও,পৃ.৫

৭৯. এআইপিপি,পৃ.৪ প্যা.১৯; পুণ:দ্রষ্টব্য-এআইটিপিএন, পৃ.১ ,প্যা.৬; এসিএইচআর, পৃ.১, প্যা.৮; অধিকার এন্ড এফআইডিএইচ, পৃ.৩ এবং ইউএনপিও,পৃ. ১-২

৮০. এসিএইচআর,পৃ.১,প্যা.৯; পুণ:দ্রষ্টব্য- বিএইচবিসিইউসি ,অন্টারিও, পৃ.১ এবং বিডিইআরএম, এনইউ এবং আইডিএসএন, প্যা.১২

৮১. এআইটিপিএন, পৃ.১০

৮২. এআইটিপিএন, পৃ.১০

৮৩. এআইটিপিএন, পৃ.৩

৮৪. অধিকার এন্ড এফঅইডিএইচ, পৃ.৪ পুণ:দ্রষ্টব্য- দ্যা ফোরাম,প্যা.৯ এবং ইউএনপিও,পৃ.২

৮৫. এওয়াইজিইউএসসি, পৃ.৫

৮৬. সিএইচআরআই, প্যা.২২

৮৭. দ্যা ফোরাম,প্যা.৫৫

৮৯. বিডিইআরএম, এনইউ এবং আইডিএসএন, প্যা.২৫

৯০. এআইটিপিএন, পৃ.১১

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের কাছে প্রেরিত আগাম প্রশ্ন

অনুবাদঃ এটিএম মোরশেদ আলম, আসক

চেক প্রজাতন্ত্র

- নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তিবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল অনুমোদন করতে বাংলাদেশ সরকার আগ্রহী কি?
- নারী, শিশু এবং যৌন আচরণগত বা লিঙ্গগত সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য মানবাধিকার বিষয়ে কী কী বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়? যৌন আচরণগত বা লিঙ্গগত সংখ্যালঘুদের আটকাবস্থায় অপব্যবহার ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষা কীভাবে নিশ্চিত করা হয়?
- মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ প্রতিনিধিদের স্থায়ী আমন্ত্রণের বিষয়টি বাংলাদেশ কীভাবে বিবেচনা করে?
- বাংলাদেশ সফর সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধিদের কিছু অনুরোধ এখনো বিবেচনাধীন আছে। এসকল বিশেষ প্রতিনিধিকে আদৌ বাংলাদেশ সফরের অনুমতি দেয়া হবে কিনা অথবা দেয়া হলে কোন্ সময়সীমার মধ্যে দেয়া হবে?

লাটভিয়া

- জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ৬৩টি দেশ মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ পদ্ধতির প্রতি স্থায়ী আমন্ত্রণ ঘোষণা করেছে।
- বিশেষ পদ্ধতির ম্যান্ডেটপ্রাপ্তদের প্রতি বাংলাদেশের অতীত সহযোগিতা (ধর্ম বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে সৃষ্ট অসহিষ্ণুতা এবং বৈষম্য বিলোপের উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ প্রতিনিধি (১৫-২৪ মে ২০০০), নারীর প্রতি সহিংসতা, এর কারণ ও ফলাফল সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি (২৪ অক্টোবর - ১৫ নভেম্বর ২০০০), খাদ্যের অধিকার সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি (২৪ অক্টোবর - ১৫ নভেম্বর ২০০২)) এবং বাংলাদেশ পরিদর্শনের জন্য বেশ কিছু বিশেষ প্রতিনিধির আবেদন বিবেচনাধীন থাকা বাংলাদেশ কি ভবিষ্যতে মানবাধিকার কাউন্সিলের সব বিশেষ প্রতিনিধির জন্য স্থায়ী আমন্ত্রণের পরিধি বর্ধিত করবে?

লিচটেনস্টাইন

- ধর্ম বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে সৃষ্ট সব ধরনের অসহিষ্ণুতা এবং বৈষম্য কমানোর উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ প্রতিনিধি ২০০০ সালে সুপারিশ করেছিল যে, বাংলাদেশ প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক এবং কারিকুলাম পরিবর্তন করবে যাতে করে এটা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় যে, বাংলাদেশের ধর্মীয় এবং নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র স্বমহিমায় প্রতিফলিত হয় এবং এক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা ও বৈষম্যহীন মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটে। বাংলাদেশ কীভাবে সেই সুপরিশগুলোর ফলোআপ করেছে?
- নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিটি (সিডও কমিটি) ২০০০ সালে জাতীয় সংসদে নারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধিকে স্বাগত জানালেও তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল যে রাজনীতি, বিচার বিভাগ, সিভিল সার্ভিস এবং পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সম্পন্ন পদে নারীর অংশগ্রহণ এখনো অনেক কম। এই উদ্বেগের বিষয়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?

নেদারল্যান্ড

- মানবাধিকার লঙ্ঘন বিশেষ করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন এবং সাংবাদিক, ধর্মীয় বা নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতিনিধিসহ মানবাধিকার কর্মীদের হয়রানি ও নির্যাতন বিষয়ে 'বিচারহীনতা'র অভিযোগ প্রসঙ্গে সরকারের পদক্ষেপ কী?
- মানবাধিকার সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে প্রহরী (ওয়াচ ডগ) প্রতিষ্ঠান যেমন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব প্রতিষ্ঠান যাতে স্বাধীন ও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?
- ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি সমস্যাসহ কারাগারের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা ভাবছে?
- নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে সরকার কার্যকর কী পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ভাবছে?
- শিশুশ্রমকে সমূলে উৎপাটনের জন্য সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণের কথা চিন্তা করছে? উদাহরণস্বরূপ– জাতীয় শিশুশ্রম নীতিকে চূড়ান্ত করতে এবং সবচেয়ে খারাপ ধরনের (ঝুঁকিপূর্ণ) কাজে শিশুদের নিয়োজিত করা প্রতিরোধে প্রণীত কর্মসূচী পুরোপুরোভাবে কার্যকর করতে কী পদক্ষেপ নেয়া হবে?

সুইডেন

- বহুসংখ্যক প্রতিবেদন থেকেই এটা প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশে নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব বিদ্যমান। বাংলাদেশের নারীরা সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০০), এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন (২০০২) এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য আইন প্রণীত হওয়ার পরও বাংলাদেশের অনেক নারী প্রতিদিনই উল্লেখযোগ্য হারে এসব নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার কি আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে সমন্বিত পারিবারিক আইন প্রণয়ন করবে? অথবা পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীদের অসম অবস্থা বিশেষ করে বিবাহ, তালাক, হেফাজত, ভরণপোষণ এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে বাংলাদেশ অন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আগ্রহী? ফতোয়া সংক্রান্ত সহিংসতাসহ নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অন্যান্য সহিংসতা প্রতিরোধে সরকার আরো কী কী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাচ্ছে? সিডিও সনদের অনুচ্ছেদ ২ (আইন সংস্কার সংক্রান্ত) এবং অনুচ্ছেদ ১৬-১-গ (বিবাহ ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার)-এ বাংলাদেশের যে সংরক্ষণ আছে তা তুলে নেয়ার বিষয়ে সরকাররের কী ইচ্ছা?
- বিচারহীনতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠায় 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর গৃহীত পদক্ষেপ ছিল খুবই প্রয়োজনীয় এবং যা বিভিন্নভাবে স্বাগতও হয়েছিল। এসব পদক্ষেপের ফলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ধারাবাহিকতা নিম্নমুখী হয়। তারপরও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশেষ করে র‍্যাপিড অ্যাকশন

ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এখনো উদ্বেগজনক। বিচারহীনতার সংস্কৃতি নির্মূল করতে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ড অনুসারে আইনগুলো কার্যকর করতে আরো কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনসহ অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচারহীনতা দূর করতে এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দায়ী এসব ব্যক্তিকে বিচারের সামনে আনার জন্য সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে? সাংবাদিকসহ মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক হয়রানি ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধে সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

গ্রেট ব্রিটেন এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড

- নির্যাতনবিরোধী সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল অনুসমর্থন করতে বাংলাদেশের পরিকল্পনা কী? বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধিসহ অন্যান্য বিশেষ প্রতিনিধিদের স্থায়ী আমন্ত্রণ পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিকল্পনা কী?
- গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে? প্যারিস নীতিমালা অনুসারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচালিত হওয়ার বিষয়টি কীভাবে নিশ্চিত করা হবে?
- নারীর অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কী পদক্ষেপ নেয়া হবে? প্রচলিত আইন যেমন– নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন কি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হচ্ছে? সিডও সনদের অনুচ্ছেদ ২ ও ১৬.১(গ) থেকে সংরক্ষণ তুলে নেয়ার বিষয়ে কি কোনো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে?
- বিচার বিভাগ এবং অতিরিক্ত বন্দি ধারণ, জামিন লাভের ক্ষেত্রে সমস্যা ও কারাবন্দি শিশুসহ কারাগার পদ্ধতির কাঠামোগত সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের পরিকল্পনা কী?
- অনানুষ্ঠানিক খাত (ইনফরমাল সেক্টরে) শিশুশ্রম নিরসনের বিষয়ে বাংলাদেশের পরিকল্পনা কী?
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের পরিকল্পনা কী? আপনারা কি পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করবেন?
- দেশের জাতীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতে নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা কতখানি?

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গিকার

অনুবাদঃ এটিএম মোরশেদ আলম, আসক

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
১. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ স্বাক্ষর সংক্রান্ত	নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল ১ ও ২ অনুস্বাক্ষর বা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করে চিলি। নির্যাতনবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল অনুস্বাক্ষর বা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করে ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, চিলি, চেক প্রজাতন্ত্র, লিচটেনস্টেইন। অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ অনুস্বাক্ষর বা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করে চিলি, আজারবাইজান, মেক্সিকো। বাংলাদেশ যেসব আন্তর্জাতিক সনদে পক্ষভুক্ত হয়েছে সেসব সনদের অধীনে ব্যক্তিগত অভিযোগ গ্রহণ করতে সুপারিশ করে নরওয়ে। অন্য যেসব সনদ বা চুক্তিতে বাংলাদেশ এখনো পক্ষভুক্ত হয়নি সেগুলোতে পক্ষভুক্ত হওয়ার সুপারিশ করে স্লোভেনিয়া।	বাংলাদেশ প্রায় সব মৌলিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের পক্ষভুক্ত হয়েছে বা গ্রহণ করেছে। অন্য সনদগুলো গ্রহণ বা অনুস্বাক্ষরের জন্য নিয়মিতভাবে পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। যেহেতু সনদগুলো রাষ্ট্রপক্ষের ওপর প্রতিবেদন দাখিলসহ অন্য অনেক বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে, সুতরাং এগুলো সতর্কতা সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। এটা করতে গিয়ে বাংলাদেশ সবসময় সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার সনদ বা ঐচ্ছিক প্রটোকলগুলোর মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে, যেমনটা বর্তমান ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়েছে । সর্বোপরি বাংলাদেশ এসব সনদের বিধানগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সনদগুলোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট।
২. শরণার্থী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ	শরণার্থী সংক্রান্ত ১৯৫১ সালের আন্তর্জাতিক সনদ গ্রহণ বা অনুস্বাক্ষর করতে সুপারিশ করে ব্রাজিল, চিলি, চেক প্রজাতন্ত্র, মেক্সিকো। আদিবাসী ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক গৃহীত সনদ নং ১৬৯ গ্রহণের সুপারিশ করে মেক্সিকো।	**১৯৫১ সালের শরণার্থী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ** যদিও বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত এই সনদে পক্ষভুক্ত হয়নি কিন্তু সনদের নীতি ও উদ্দেশ্যগুলো বাংলাদেশ সমুন্নত রেখেছে। পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আসা শরণার্থীদের দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ আশ্রয় দিচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোনো শরণার্থীকে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। মায়ানমার থেকে আসা প্রায় তিন লাখ শরণার্থীকে কোনোরূপ আন্তর্জাতিক সহায়তা ছাড়াই শুরুর দিকে আশ্রয় ও সহায়তা দিয়েছে এবং এখনো দিচ্ছে। গত তিন বছরে কোনো শরণার্থীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়নি এবং খুব সামান্য আন্তর্জাতিক সহায়তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে শরণার্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে, তাদের উন্নত সুযোগ-

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
		সুবিধা প্রদান করছে এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা উন্নত করছে। মায়ানমার থেকে আসা এসব শরণার্থীর অধিকার রক্ষা বিষয়টি একাধিকবার জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। শরণার্থী সংক্রান্ত সার্বিক আঞ্চলিক পরিস্থিতি এবং বিদ্যমান অবস্থার আলোকে শরণার্থী বিষয়ক সনদ স্বাক্ষর করার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি নিয়মিতভাবে বিবেচনায় রেখেছে। **আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ নং ১৬৯** ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক আদিবাসী ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য প্রণীত সনদ নং ১০৭, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করেছে। এই সনদে আদিবাসী ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকারসহ অনেক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, যেমন– ভূমির অধিকার, কারিগরি প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যের অধিকার ইত্যাদি। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে নিয়োগ ও পেশাগত বৈষম্য সংক্রান্ত সনদ নং ১১১ও অনুস্বাক্ষর করেছে। যদিও বাংলাদেশ এখনো সনদ নং ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করেনি কিন্তু পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী ১৬৯নং সনদে অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ অধিকারই ভোগ করছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির অধিকাংশ বিধান ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে এই চুক্তির বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে।
৩. সংরক্ষণ প্রত্যাহার	ইতোমধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে যেসব সংরক্ষণ রেখেছে তা পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানায় স্লোভেনিয়া। নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদের ওপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহারের বিবেচনা সংক্রান্ত সুপারিশগুলো বাংলাদেশ গ্রহণ করে। তবে বাংলাদেশ হলো সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি রাষ্ট্র তাই

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
	আন্তর্জাতিক সনদের ২ ও ১৬(১)(গ) অনুচ্ছেদের ওপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহারের সুপারিশ করে ফ্রান্স ও নরওয়ে।	সংরক্ষণ প্রত্যাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় সব ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে বিস্তৃত ঐক্যের বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।
৪. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড কার্যকর রাখা	আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে চলমান প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে সুদান। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির বিধানগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের জনগণের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের আহ্বান জানায় লাওস। দেশের প্রচলিত আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার চলমান প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে মিসর।	আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে জনগণের মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের চলমান প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং দেশের প্রচলিত আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সংক্রান্ত সুপারিশগুলো বাংলাদেশ গ্রহণ করে।
৫. মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার	জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা এবং মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে দেশের আইন, নীতি এবং এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের অব্যাহত প্রচেষ্টাকে জারি রাখার সুপারিশ করে মিসর।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে। ইতোমধ্যেই জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৭'-এর অধীনে সরকার 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' গঠন করেছে। 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯' নামে একটি খসড়া আইন সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। খসড়াটি বর্তমানে জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে যাচাই-বাছাই পর্যায়ে রয়েছে।
৬. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	মানবাধিকার সুরক্ষার প্রহরী হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান যাতে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য এই প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি এবং কার্যপ্রণালির উন্নয়ন ঘটানোর আহ্বান জানায় মিসর। প্যারিস নীতির আলোকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যাতে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে সে	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে। সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
	লক্ষ্যে কমিশনকে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করে যুক্তরাজ্য।	
৭. জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন যাতে স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কার্যকর হতে পারে সেজন্য এসব প্রতিষ্ঠানকে আরো শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করে নেদারল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে। সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
৮. নারী ও শিশুদের উন্নয়ন	প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুসহ সব নারী, বালিকা ও শিশুদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখার জন্য সুপারিশ করে নাইজেরিয়া। সেই সাথে জনগণ যাতে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো ভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায় নাইজেরিয়া।	বাংলাদেশ নাইজেরিয়ার সুপারিশগুলো গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যেই এক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কাউন্সিল' গঠন করা হয়েছে। এই কাউন্সিল নারী ও শিশুদের সুরক্ষার জন্য বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাগুলো সংশোধনের সুপারিশ করবে।
৯. মানবাধিকার সচেতনতা	সাধারণ জনগণের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায় আজারবাইজান।	বাংলাদেশ আজারবাইজানের সুপারিশ গ্রহণ করে।
১০. জাতীয় মানবাধিকার কার্যক্রম গ্রহণ	মানবাধিকার রক্ষার কার্যক্রমগুলোতে গতিসঞ্চার করতে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিশেষ করে বিচারহীনতা, অন্যায় ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও অবমাননাকর আচরণের প্রতিকার বিধানে সরকারের অঙ্গীকার ও দৃঢ়সংকল্পকে নতুন গতি প্রদানের জন্য মেক্সিকো বাংলাদেশ সরকারকে একটি জাতীয় মানবাধিকার কার্যক্রম গ্রহণের আহ্বান জানায়।	সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের এসব ঘটনার প্রতিকার বিধানে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। তবে এক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষা ও তার উৎকর্ষ সাধনে গৃহীত সার্বিক ব্যবস্থা এবং দেশের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় নিতে হবে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় নজরদারি করা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকরী বাহিনী যাতে মানাবাধিকার মানদণ্ড অনুসরণ করে সরকারের পক্ষ থেকে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলায় নিয়োজিত বাহিনীগুলোর প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
		কারিকুলামেও মানবাধিকার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইউএনডিপি, আন্তর্জাতিক রেডক্রসসহ কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সম্প্রতি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। আশা করা হচ্ছে পুলিশ পুনর্গঠন পরিকল্পনাও এ লক্ষ্যে সুফল বয়ে আনবে।
১১. মানবাধিকারের সপক্ষে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ	ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পুলিশ, বিচার বিভাগ, নাগরিক সমাজ এবং সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার সুপারিশ করে যুক্তরাজ্য।	বাংলাদেশ এই সুপারিশ গ্রহণ করে। সরকার ইতোমধ্যে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করেছে এবং জনগণের দ্রুত ও কার্যকর বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কার্যকর বিচার পরিচালনার জন্য জাতীয় কর্মকৌশল নির্ধারণে সরকার পুলিশ ও নাগরিক সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে।
১২. জাতিসংঘের বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি	সব বিশেষ পদ্ধতির প্রতি স্থায়ী আমন্ত্রণ প্রেরণের সুপারিশ করে চেক প্রজাতন্ত্র ও মেক্সিকো। সংক্ষিপ্ত বিচার বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষ প্রতিবেদককে আমন্ত্রণের বিষয় ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করার সুপারিশ করে ব্রাজিল।	বাংলাদেশ 'বিশেষ পদ্ধতি' ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতিসংঘের কিছু বিশেষ প্রতিবেদক বাংলাদেশ সফর করেছেন। কিছু অনুরোধ বিবেচনাধীন আছে, শিগগিরই চূড়ান্ত হবে। বাংলাদেশ মনে করে না যে, স্থায়ী আমন্ত্রণ পাঠানোই এই ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করার একমাত্র উপায়।
১৩. নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় আইনি সংস্কার	নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষায় এবং তাদের প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করতে বিদ্যমান আইনগুলোকে কার্যকরভাবে ও সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগের আহ্বান জানায় থাইল্যান্ড। নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিশু অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন এবং দারিদ্র্যকে সমূলে উৎপাটন গুরুত্বসহ বিবেচনার সুপারিশ করে সিঙ্গাপুর।	বাংলাদেশ এসব সুপারিশ গ্রহণ করে।

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
১৪. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা	নারী অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে বাংলাদেশের ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো অব্যাহত রাখার অনুরোধ করে কিউবা। জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক ভুমিকা উন্নয়নে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা অন্যদের সাথে বিনিময় অব্যাহত রাখর আহ্বান জানায় লাওস।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।
১৫. নারী অধিকার রক্ষায় প্রচলিত আইনের সংশোধন ও কার্যকর প্রয়োগ	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন ও যৌতুক নিরোধ আইনসহ দেশের অন্যান্য প্রচলিত আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে নারী অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানায় অস্ট্রেলিয়া। জার্মানি এবং নরওয়ে সুপারিশ করে যে, নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করতে প্রচলিত আইনগুলোর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে, প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং অনতিবিলম্বে একটা সমন্বিত পারিবারিক আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি সব ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য দূর করতে এবং কর্মজীবী নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করতে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করারও আহ্বান জানায় নরওয়ে। নেদারল্যান্ডের সুপারিশ হলো– প্রচলিত আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে নারী অধিকার সুরক্ষাকে নিশ্চিত করতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে একটা সমন্বিত জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সিডও সনদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটা সমন্বিত পারিবারিক আইন প্রণয়ন করতে হবে। বাল্যবিবাহ এবং জোরপূর্বক বিবাহের হাত থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য সরকারের কার্যক্রমের গতি আরো বাড়ানোর আহবান জানায় লিচটেনস্টেইন।	সমন্বিত পারিবারিক আইন ছাড়া অন্য সব সুপারিশ বাংলাদেশ গ্রহণ করে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ এবং যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ অনুসারে বাল্যবিবাহ, যৌতুক বাংলাদেশে নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সরকার সম্প্রতি নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করেছে এবং সন্তানের নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করেছে। মজুরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নারী-পুরুষে কোনো অসমতা নেই এবং নারীরা ৪ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ করে। সাংস্কৃতিক আর ধর্মের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি দেশ। সুতরাং এখানে সব ধর্ম এবং গোষ্ঠীর জন্য একটা সমন্বিত পারিবারিক আইন প্রণয়ন করতে হলে ব্যাপক মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সরকার সব ধর্ম ও গোষ্ঠীর মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার সাথে আলোচনা করবে।

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
	বাংলাদেশি নারী বিদেশি কোনো নাগরিককে বিয়ে করলে তাদের সন্তানের নাগরিকত্ব নির্ধারণে প্রয়োজনে প্রচলিত আইন সংশোধনের সুপারিশ করে চেক প্রজাতন্ত্র।	
১৬. শিশু অধিকার	আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের বিধানগুলো বিবেচনায় আনাসহ শিশুদের প্রতি সব ধরনের শারীরিক নির্যাতন বন্ধের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায় ব্রাজিল। সেই সাথে ফৌজদারি অপরাধের দায়ে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শিশুদের বয়সসীমা বাড়ানোরও প্রস্তাব করে ব্রাজিল। শিশু অধিকারের ক্ষেত্রে জাতীয় আইন ও এর প্রায়োগিক দিক পুনর্বিবেচনা করে এগুলোকে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা, বিশেষ করে অপহরণ ও পাচার থেকে সুরক্ষা এবং কিশোর অপরাধীদের বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কারাবন্দি ও আটক শিশুদের যোগাযোগের পর্যাপ্ত সুবিধা দেয়াসহ তাদের মানবাধিকার রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে চেক প্রজাতন্ত্র। শিশু অধিকার সুরক্ষা এবং এ সংক্রান্ত আইনগুলোকে আরো কার্যকরভাবে প্রয়োগের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায় ইন্দোনেশিয়া। শিশু অধিকার রক্ষায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪সহ অন্য প্রচলিত আইনগুলো বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অবিলম্বে জোরদার করার সুপারিশ করে ইতালি।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।
১৭. ধর্মীয় সংখ্যালঘু	ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বৈষম্যের শিকার হলে বা তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে এসব ঘটনার সঠিক তদন্ত করার আহ্বান জানায় হলি সি। সেই সাথে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এসব ঘটনা শিক্ষা ও সচেতনতা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করারও সুপারিশ করে হলি সি।	বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম অথবা অন্য কোনো কারণে কোনো ধরনের বৈষম্য সরকার সহ্য করে না। সব নাগরিকের জন্য সমান অধিকার– এই নীতি বাংলাদেশের সংবিধান, রাষ্ট্রীয় আইন এবং সরকারের নীতি ও কর্মপরিকল্পনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত। অধিকন্তু পিছিয়ে থাকা

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
		জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা, চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ সরকার ইতোমধ্যেই নিয়ে রেখেছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কল্যাণের বিষয়টি বর্তমান সরকারের বিশেষ বিবেচনায় আছে। যে কোনো বৈষম্যের অভিযোগ গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হয়।
১৮. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী	প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণে অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে যুক্তরাজ্য। শরণার্থীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার অহ্বান জানায় মেক্সিকো।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই লিঙ্গভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার প্রচলন করেছে। বাংলাদেশের মোট বাজেটের অর্ধেকেরও বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য। 'দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করা সংক্রান্ত জাতীয় কর্মকৌশলে (এনএসএপিআর)' সুনির্দিষ্টভাবে দরিদ্র নারীদের গুরুত্ব দেয়া হয়। দরিদ্র নারী এবং শিশুরা যেসব বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয় তা প্রতিরোধে একটি বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা-জাল তৈরি করা হয়েছে। যেমন– ক. বিধবা, দুস্থ এবং স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের জন্য ভাতা ব্যবস্থা, খ. অসহায় গোষ্ঠির জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা, গ. অতিদরিদ্রদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ঘ. গর্ভবতী এবং স্তনদানকারী মায়েদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা।
১৯. মৃত্যুদণ্ড বিলোপ	ফ্রান্স মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করার জন্য শক্তভাবে সুপারিশ করে এবং বিলোপ করার এরূপ সিদ্ধান্ত যতদিন না নেয়া হবে ততদিন পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর না করার সুপারিশ করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত নং ৬২/১৪৯-এর আলোকে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করার উদ্দেশ্যে এরূপ শাস্তি কার্যকর না করার সুপারিশ করে ব্রাজিল। মৃত্যুদণ্ড বাতিলের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে এই শাস্তি কার্যকর না করার সুপারিশ করে চিলি। মৃত্যুদণ্ডের পরিসর সংকোচনের উদ্দেশ্যে	সুপারিশগুলো গ্রহণ করার মতো অবস্থায় বাংলাদেশ নেই। বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডকে ঘৃণ্যতম অপরাধ যেমন– এসিড নিক্ষেপ, সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা, পরিকল্পিতভাবে মানুষ হত্যা করা, মাদক পাচার করা, ধর্ষণ, নারী ও শিশু অপহরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রশাসন ও বিচার বিভাগ উভয়ই মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সমবেদনার দৃষ্টিতে দেখে এবং শুধু চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেই এই শাস্তি প্রদান করা হয়।

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
	প্রচলিত যেসব আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে সেগুলো সংশোধন করা এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার সুপারিশ করে ইতালি। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো এবং মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার ভিত্তিতে জাতীয় আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিলোপ করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের ওপর স্থগিতাদেশ গ্রহণেরও আহ্বান জানায় ইতালি।	বর্তমান আইনি ব্যবস্থাতে এরূপ শাস্তি কার্যকর করার পূর্বে অনেক আইনি পদক্ষেপ অবলম্বন করতে হয়। যেমন– বিচারিক আদালতে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নিশ্চিত করতে হয়। হাইকোর্ট বিভাগ এরূপ মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিলও করতে পারে। হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিলের সুযোগ আছে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রপতি এরূপ মৃত্যুদণ্ডাদেশ মার্জনাও করতে পারেন।
২০. বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন বন্ধ করা এবং কারা ব্যবস্থা উন্নয়নে সুপারিশ করে নেদারল্যান্ড।	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনকে সরকার বরদাশত করে না। পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন কোনো ব্যক্তির সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে তা স্পষ্টভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ৬০, ৬১ ও ১৬৭ ধারায় এবং পুলিশ কোডের ৩২৪, ৩২৭ ও ৩২৮ বিধিতে বর্ণিত আছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা এবং এরকম কাজে জড়িত যে কোনো ব্যক্তিকে বিচারের সম্মুখীন করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। কারা ব্যবস্থার উন্নয়ন হলো একটা চলমান প্রক্রিয়া যা অনেকাংশেই অর্থনৈতিক সঙ্গতির ওপর নির্ভরশীল।
২১. নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং সরকারের প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করা সুপারিশ করে মালয়েশিয়া। বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং এসব কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর সরকারের নজরদারি ও পরিদর্শন বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধের আহ্বান জানায় মালয়েশিয়া। লিচটেনস্টাইন নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
	একটি সমন্বিত কর্মকৌশল প্রণয়নের সুপারিশ করে। নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে একটি সমন্বিত কর্মকৌশল প্রণয়নসহ তাদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায় কোরিয়া।	
২২. শিশুশ্রম নিরসননীতি	শিশুশ্রমকে সমূলে উৎপাটনের জন্য জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি চূড়ান্ত করা এবং সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কার্যকর করার সুপারিশ করে অস্ট্রেলিয়া।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।
২৩. যৌন সহিংসতা শিশু নির্যাতন ও পাচারবিরোধী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা	যৌন সহিংসতা, শিশু নির্যাতন এবং পাচারের বিরুদ্ধে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কার্যকরভাবে প্রয়োগের চলমান পদক্ষেপ অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে তুরস্ক।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কার্যকরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কাজ করছে।
২৪. দুর্নীতি দমন	দুর্নীতি দমনের চলমান প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায় আজারবাইজান।	বাংলাদেশ সুপারিশটি গ্রহণ করে।
২৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা	বিচার বিভাগকে অধিকতর শক্তিশালী করার নিমিত্তে বাংলাদেশের গৃহীত ইতিবাচক উদ্যোগগুলো অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে ভুটান। বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায় অস্ট্রেলিয়া।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে। বিচার বিভাগকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে পৃথক জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন, জুডিশিয়াল বেতন কমিশন এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। জুডিশিয়াল বেতন কমিশন সম্প্রতি বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়নের সুপারিশ করেছে যা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে। বিচার বিভাগের কাজকে মসৃণভাবে চালানোর জন্য সরকার ইতোমধ্যেই নিম্ন আদালতের জন্য বেশ কিছু বিচারক নিয়োগ দিয়েছে।

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
২৬. বিচারহীনতা ও দায়হীনতার সংস্কৃতি	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে যে বিচারহীনতা ও দায়হীনতার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করে অস্ট্রেলিয়া, এক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায় চেক প্রজাতন্ত্র। সাধারণ জনগণকে হয়রানি ও নির্যাতনের দায়ে দোষী সব কর্মকর্তা ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায় জার্মানি।	বাংলাদেশ সরকার এধরনের ঘটনাকে কখনো বরদাশত করে না। এক্ষেত্রে দায়ী সব কর্মকর্তাকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।
২৭. যৌন সম্পর্ক ও যৌন আচরণ সম্পর্কিত	নারী, শিশু এবং যৌন আচরণ সংক্রান্ত বা লিঙ্গগত সংখ্যালঘুদের অধিকারগুলোকে গুরুত্ব আরোপ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য মানবাধিকার বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং উল্লিখিত সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধে অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে চেক প্রজাতন্ত্র। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য না করা এবং এক্ষেত্রে সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণেরও সুপারিশ করে চেক প্রজাতন্ত্র। দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারাকে বাতিল করার সুপারিশ করে চিলি। এই ধারায় 'প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ' যৌনতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশগুলো বাংলাদেশ গ্রহণ করে। নারী, শিশু ও সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। তবে যৌন আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশগুলো বাংলাদেশের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত মূল্যবোধের সমাজ প্রতিষ্ঠিত। দেশের কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সমকামিতা গ্রহণযোগ্য আচরণ নয়। দেশের ভেতর এর বিরুদ্ধে কোনোরূপ উদ্বেগও কেউ প্রকাশ করেনি। সুতরাং এধরনের সুপারিশ বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়।
২৮. মানবাধিকার কর্মীদের মানবাধিকার রক্ষা	সাংবাদিকসহ অন্য মানবাধিকার কর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে অস্ট্রেলিয়া ও নেদারল্যান্ড।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে। ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
২৯. ধর্মীয় স্বাধীনতা	প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করার আহ্বান জানায় ইতালি।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনি সুরক্ষা বাংলাদেশে কার্যকর আছে।

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
৩০. দারিদ্র্য বিমোচন	সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে বিশেষ করে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে গৃহীত কর্মকৌশল অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে সৌদি আরব। খাদ্য সরবরাহ, অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম যা জনসংখ্যার বিশেষ অংশের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে তা আরো বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানায় ভেনিজুয়েলা। দারিদ্র্য বিমোচনকে গুরুত্ব দিয়ে যেসব কার্যক্রম, পরিকল্পনা এবং নীতি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোকে আরো কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে জিম্বাবুয়ে। উন্নয়ন সমস্যা এবং দারিদ্র্য মোকাবেলা করার নিমিত্তে কর্মসংস্থানের এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সুপারিশ করে বাহরাইন।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।
৩১. খাদ্যের অধিকার	জনগণের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে ভিয়েতনাম।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে। জনগণের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষকদের সময়মতো কৃষি উপকরণ সরবরাহের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সার ও সেচের জন্য ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্য কমানো, মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ ইত্যাদি অনেক কৃষক সহায়ক পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে।
৩২. স্বাস্থ্যের অধিকার	সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের, বিশেষ করে নারীদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্য ও জন্মদান-পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক জাতীয় কর্মকৌশল অব্যাহত রাখার আহবান জানায় সৌদি আরব। বৈষম্যহীনভাবে সব জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জাতীয় কর্মকৌশল অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে বাহরাইন।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
৩৩. শিক্ষার অধিকার	নারীশিক্ষাসহ সামগ্রিক শিক্ষার অধিকারকে সুরক্ষা ও উন্নয়নের ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো জারি রাখার সুপারিশ করে কিউবা। জনগণের শিক্ষার মানোন্নয়নে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার আহ্বান জানায় চীন।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।
৩৪. পার্বত্য শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য শান্তিচুক্তির সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং এরূপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সময়সীমা নির্ধারণের সুপারিশ করে নরওয়ে ও অস্ট্রেলিয়া।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। এই চুক্তির অধিকাংশ বিধান ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট বিধানগুলো বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।
৩৫. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা	খাদ্যের অধিকার বাস্তবায়নে এবং দারিদ্র্য মোকাবেলায়, বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা এবং সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে বিনিময় করার সুপারিশ করে মালয়েশিয়া।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।
৩৬. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত	বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে দারিদ্র্য, বিশেষ করে নারীদের বস্তুগত ও অবস্তুগত দারিদ্র্য (বঞ্চনা অর্থে) মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে আলজেরিয়া। আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও শিক্ষাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে ভুটান। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে চালু রাখার আহ্বান জানায় কলম্বিয়া। বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিবেদনে উল্লিখিত সব বাধা ও সমস্যা	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
	মোকাবেলায়, বিশেষ করে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে এবং মানবাধিকার ও জাতীয় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এমন সব পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৌশলগত সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চাওয়ার সুপারিশ করে সুদান। সেই সাথে, অন্যান্য স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষা-জাল ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত সর্বোৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতাগুলো বিনিময় করার আহ্বান করে সুদান।	
৩৭. নারী অধিকার রক্ষায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা	নারীরা যেহেতু সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তারা দেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে, এজন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে নারী অধিকার বাস্তবায়নে এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায় আলজেরিয়া।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।
৩৮. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ	আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত সহযোগিতা নিয়ে সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতির জন্য অধিকতর প্রচেষ্টার সুপারিশ করে আজারবাইজান।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।
৩৯. বাংলাদেশকে সহযোগিতা	বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা মোকাবেলায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও কৌশলগত সহযোগিতায় বাংলাদেশের অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অনুরোধ জানায় ভিয়েতনাম।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।
৪০. বিভিন্ন সনদের আওতায় প্রতিবেদন প্রদান	বিভিন্ন সনদের আওতায় প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধির আহ্বান জানায় মিসর।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।

ক্রমিক নং ও বিষয়	সুপারিশ	বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গীকার
৪১. পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা	মানবাধিকার কাউন্সিলের অধীনে পরিবেশ ও মানবাধিকার বিষয়ে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে আলজেরিয়া। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে পরিবেশগত পরিবর্তনের খারাপ দিকগুলো মোকাবেলায় এবং সেই সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় চলমান প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখা এবং জোরদার করার সুপারিশ করে ভুটান। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি এবং মানবাধিকার রক্ষার প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ কমে যাওয়ায় বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে টিকসই পরিবেশ ব্যবস্থা উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় নীতিতে বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে প্যালেস্টাইন।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।
৪২. নাগরিক সমাজের সঙ্গে সংলাপ	এই পুনর্বীক্ষণের পরবর্তী ধাপগুলোতে নাগরিক সমাজের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সুপারিশ করে যুক্তরাজ্য।	বাংলাদেশ সুপারিশগুলো গ্রহণ করে।

সপ্তম অধ্যায়

চূড়ান্ত অধিবেশনে ইউপিআর ফোরামের পক্ষ থেকে পঠিত বিবৃতি

অনুবাদঃ সুবর্ণা সরকার, আসক

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ১১তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২-১৮ জুন ২০০৯। ১০ জুন বাংলাদেশের চূড়ান্ত ইউপিআর সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সে অধিবেশনের প্রাক্কালে ইউপিআর ফেব্রুয়ারি সেশনে সরকারের তরফ থেকে দেয়া অঙ্গীকারগুলো বিষয়ে জুন পর্যন্ত কী কী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে এই রিপোর্টটি প্রস্তুত করে। রিপোর্টটি বাংলাদেশসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের জেনেভা কার্যালয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার কাছে পাঠানো হয়। ৭ জুন ২০০৯ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এটি নিয়ে একটি মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয় এবং ১০ জুন জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে এই প্রতিবেদনের চুম্বক অংশ বিবৃতি আকারে উপস্থাপন করেন ইউপিআর ফোরামের সমন্বয়ক সাঈদ আহমেদ।

যুদ্ধাপরাধ, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, অন্যায় আটক ও বন্দিত্ব, নারী নির্যাতন, আদিবাসী নির্যাতন বিষয়ে তদন্ত নিশ্চিত করা, বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ, আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং একই সাথে জোরপূর্বক উচ্ছেদ রোধ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুসংহতকরণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ইউপিআর ফোরামের আহ্বান

২০০৯-এর ফেব্রুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপগুলো এ সুযোগে ইউপিআর ফোরাম তুলে ধরতে চায়, যার মধ্যে থাকবে সরকারের অর্জন, বাস্তবায়িত হয়নি এমন অঙ্গীকারগুলো এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান উদ্বেগগুলো। এই প্রেক্ষিতে ইউপিআর ফোরাম সরকারের তরফে সময়সীমা উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট এবং পরিমাপযোগ্য অঙ্গীকার প্রদানের আহ্বান জানায়, যাতে করে তা জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত নথিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

সর্বজনীন পুনর্বীক্ষণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ

৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালীন সময়ে ৪৮টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সুপারিশ প্রদান করে।[১] আটটি রাষ্ট্রের উত্থাপিত আগাম প্রশ্নমালাও বাংলাদেশ আগেভাগেই পায়। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রধান পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের জবাব দেন এবং মতামত প্রকাশ করেন। তিনি একই সাথে ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুপারিশমালা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে। এই সুপারিশমালার জবাবে বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া ১০ জুন ২০০৯ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ২১তম অধিবেশনে গৃহীত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হবে।

মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের পুনর্নির্বাচিত হওয়া

কিছু নতুন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশ ১২ মে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দ্বিতীয় মেয়াদে ৩ বছরের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। প্রথম নির্বাচনের সময় দেয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি বিশেষত মানবাধিকার রক্ষা এবং দুর্নীতি দমনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মতো বিষয়ে জানুয়ারি ২০০৯-এর পর

১. ইউপিআর ৪র্থ সেশন অনুষ্ঠিত হয় ২-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতার পরও বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মতো জয়লাভ করে। একটি জাতীয় মানবাধিকার কর্মসূচি গ্রহণের সুপারিশকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা, সুশীল সমাজ এবং সরকারের সমন্বয়ে সুবিচার প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে কোনো জাতীয় কৌশল উদ্ভাবন করা হয়নি। এমনকি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে নতুন কোনো অনুসমর্থনের কিংবা জাতীয় আইনগুলোকে মানবাধিকারের মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ব্যাপারে কোনো ঘোষণা দেয়া হয়নি। নারী, শিশু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর প্রতি অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির উদ্দেশ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বিচারকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কোনো কর্মসূচি নেয়া হয়নি। ফেব্রুয়ারি মাসের পর্যালোচনা ফলোআপের ক্ষেত্রেও সরকার সুশীল সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং অবৈধ আটকাদেশের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া বিষয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে করা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অঙ্গীকার সুদূরপরাহত বলে মনে হচ্ছে। আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে অপরাধীকে দণ্ড থেকে অব্যাহতি দেয়ার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

এই ডকুমেন্টে ইউপিআর ফোরামের প্রধান প্রধান উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলো এবং সরকারের করণীয় বিষয়ে সুপারিশমালা দেয়া হলো :

যুদ্ধাপরাধ : ৯ এপ্রিল এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় একটি তদন্তকারী সংস্থা গঠন, আইন কর্মকর্তা নিয়োগ এবং ট্রাইব্যুনাল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। যেসব বাংলাদেশি নাগরিক পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ এবং অগ্নিসংযোগের সহযোগিতা করেছিল, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩-এর অধীনে তাদের উক্ত ট্রাইব্যুনালে বিচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইন কমিশন সম্প্রতি ১৯৭৩-এর আইন বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড : বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ইতি টানা হবে মর্মে নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার করা এবং ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ মানবাধিকার কাউন্সিলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বিষয়ে 'শূন্য সহনশীলতার' ঘোষণা সত্ত্বেও এ ধরনের হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে এবং এক্ষেত্রে কোনো ধরনের তদন্তের ঘোষণা বা এটা বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সরকারের তথ্যমতে, জানুয়ারি থেকে মে ২০০৯ পর্যন্ত কমপক্ষে ২৫ জন মানুষ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে।[২] সরকার তদন্তের সিদ্ধান্ত দেয়ার পরিবর্তে দাবি করছে যে, আত্মরক্ষার্থে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এটা করতে পারে।[৩] সর্বশেষ ২৮ মে ২০০৯ জাতীয় সংসদ এলাকায় র‍্যাবের হাতে দু'জন ছাত্রের নিহত হওয়ার ঘটনা 'ক্রসফায়ার'-এর নাম করে যে অরাজক পরিস্থিতি চলছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ হিসেবে হাজির হয়েছে। তাদের নামে কোনো থানায় জিডি পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ রাইফেল (বিডিআর) বিদ্রোহ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৫৯ জন অফিসারসহ ৭৮ জনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ২২ জন বিডিআর সদস্যের হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনাকে আত্মহত্যা বা হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু বলে চালানো হয়েছে। কিছু ঘটনায় নিহতের পরিবার নিহতের শরীরে নির্যাতনের চিহ্নের উল্লেখ করেছে। কীভাবে হার্ট অ্যাটাক এড়ানো যায় সরকার সংবাদ

২. আসক পরিসংখ্যান মে, ২০০৯।

৩. স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজীম আহমেদের ৬ মে বক্তব্য '...সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করবে না, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংবিধান অনুসারে আত্মরক্ষার অধিকার আছে।"

বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তা বিডিআর সদস্যদের অবহিত করেছে। সবশেষে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে। এসব দেখেশুনে মনে হচ্ছে যে, এসব মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে না।

নির্যাতন হতে মুক্তি : আমাদের সংবিধানে নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকার পরেও আইনে এর কোনো বিস্তারিত প্রতিকার নেই এবং এর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ খতিয়ে দেখা বা জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করার ব্যাপারে কোনো রীতি নেই। নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যুকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য ৫ মার্চ একটি বেসরকারি সদস্য বিল সংসদে উত্থাপিত হলেও তা আটকে আছে। সরকার নিজে থেকেও এ ব্যাপারে কোনো আইনি পরিকল্পনা ঘোষণা করেনি।

নিরপেক্ষ বিচার পাওয়ার অধিকার : বিচার বিভাগ পৃথককরণে আইন প্রণয়নের সময় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম রাখে। সেটা হলো– কিছু কিছু ক্ষেত্রে (ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৯০ ধারামতে) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে বিচারিক ক্ষমতা রেখে দেয়া হয়। এতে বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ আশঙ্কা করা হচ্ছে। সরকার 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা হয়রানিমূলক' মামলাগুলো তুলে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে গুরুতর দুর্নীতি এবং সহিংসতার সাথে যুক্ত রাজনৈতিক নেতাদের মামলাও রয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বের মামলাগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকা হচ্ছে এবং ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিবিদদের মামলাগুলো দ্রুত প্রত্যাহার হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব, মামলা সম্পর্কে মানুষকে না জানানো অথবা প্রত্যাহারকৃত মামলার ধরন এবং এই প্রক্রিয়ায় সরকারি উকিল ও মন্ত্রীরা যারা এক সময় এসব মামলার আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন, তাদের ভূমিকা প্রশ্নের উদ্রেক ঘটাচ্ছে যে এটা কি ভিন্ন আঙ্গিকে দায়মুক্তি? সরকার ঘোষণা দিয়েছে যে, বিচার বিভাগ পৃথককরণ পুরোপুরি কার্যকর করার জন্য একটি শক্তিশালী জুডিশিয়াল সার্ভিস সেক্রেটারিয়েট স্থাপন করা হবে। কিন্তু বিচার বিভাগে কর্মরতদের নিম্নবেতন স্কেল এবং তাদের কর্মস্থলের অবস্থা তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার পথে বাধা হিসেবে রয়েই গেছে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা : জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে সম্প্রতি করা অঙ্গীকারে বাংলাদেশ নিজেকে 'বিশ্বের অন্যতম স্বাধীন প্রচারমাধ্যমের অধিকারী' দেশ বলে দাবি করেছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যম সম্পূর্ণভাবে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং বেশিরভাগ প্রতিবেদনই মন্ত্রীদের কাজের ফিরিস্তি। বেসরকারি চ্যানেলগুলো বেশিরভাগই সরকারি এবং বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতাদের মালিকানায়। প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে কবিতা লেখার ঘটনা রিপোর্ট আকারে আসায় একজন সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে যেতে হয়েছে।[৪] সাংবাদিকদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী অথবা ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের হামলার ঘটনায় কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।[৫] তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নকে স্বাগত জানালেও আমরা উল্লেখ করতে চাই ২০০৩ সালে মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার বাংলাদেশ সফরের অনুরোধ জানালেও সরকার এখনো তাতে সাড়া দেয়নি।

৪. সমকাল, ৩ মার্চ ২০০৯।

৫. আওয়ামী লীগ এমপি ক্যাপ্টেন (অব.) গিয়াসউদ্দিন আহমেদের অনুসারীরা সমকালের গফরগাঁও প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল আমিনকে নির্যাতন করে (সমকাল, ১২ এপ্রিল ২০০৯।

বাসস্থানের অধিকার : বাংলাদেশ সরকার বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন প্রকল্প সচল করার উদ্যোগ নেয়নি। এমনকি এজন্য জমি বরাদ্দও করেনি। বস্তিবাসীদের জন্য সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে করা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম তদন্তের ক্ষেত্রে গঠিত সংসদীয় কমিটি এখনও কোনো সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

শিক্ষার অধিকার : মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার এবং নবম শ্রেণী[৬] পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণের ঘোষণার মধ্য দিয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নে[৭] কমিটি গঠনকে ফোরাম সাধুবাদ জানায়। ২০১৩ সালের মধ্যে প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২০২০ সালের মধ্যে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তকেও ফোরাম স্বাগত জানায়।[৮] কিন্তু আদিবাসীদের নিজ ভাষায় শিক্ষার সুযোগ বা প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

নারীর প্রতি সহিংসতা : জানুয়ারি ২০০৯ থেকে এ যাবৎ ৭৩টি ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা, ৪৪টি যৌতুকের কারণে নির্যাতন এবং ছয়টি ফতোয়া দেয়ার ঘটনা ঘটেছে।[৯] সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যে আছে 'অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক' স্থাপনের অভিযোগে স্থানীয় মৌলবিরা একজন নারী ও তার বাবাকে প্রকাশ্যে পেটানোর জন্য ফতোয়া জারি করে। যদিও জড়িতদের আটক করা এবং ফতোয়ার শিকার নারীকে দ্রুত চিকিৎসা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা সরকার করেছে; কিন্তু এ ধরনের ফতোয়া বন্ধের জন্য বা এ ধরনের ফতোয়া দেয়া যে বেআইনি তা জানানোর জন্য সরকার থেকে কোনো দিকনির্দেশনা দেয়া হয়নি। গৃহাভ্যন্তরে সহিংসতার হার বেড়ে যাওয়া এবং মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এনজিওদের তরফ থেকে এ সংক্রান্ত আইনের খসড়া দাখিল করলেও সরকার এ ধরনের গৃহনির্যাতন বন্ধে আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ইউএনডিপির সহযোগিতায় পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি চলমান থাকার পরও দেখা যায় যে, পুলিশ এখনও ধর্ষণসহ এধরনের নির্যাতন নথিভুক্ত করে না এবং আদালতের দীর্ঘসূত্রতার সাথে সাথে ভিকটিম এবং সাক্ষীদের নিরাপত্তার অভাব বহাল থাকায় এসব ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া প্রায়ই ব্যর্থ হচ্ছে। যৌন নিপীড়ন বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণের আইনি নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সরকার এক্ষেত্রে কোনো ধরনের উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সম্প্রতি হাইকোর্ট কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনা কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে আজ অবধি তা স্পষ্ট করেনি। হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন সংস্কার সংক্রান্ত আইনমন্ত্রীর অভিমত ছাড়া বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত আইনগুলো যা পরিবারে নারীদের সমতার অধিকার ক্ষুণ্ন করে তা সংশোধনে সরকার কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেয়নি।

যদিও এখন বাংলাদেশি নারীর বিদেশি স্বামীর ঔরসজাত সন্তান নাগরিকত্ব পায়, কিন্তু ওই বিদেশি স্বামীকে নাগরিকত্ব পেতে স্থায়ী বসবাসের নিয়ন্ত্রিত শর্তগুলো পালন করতে হয়। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে এখন পর্যন্ত কোনো জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সব সরকারি ও বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটিপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা কিংবা বিদ্যমান মজুরি বৈষম্য দূর করতে কোনো সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

৬. শরিফুজ্জামান, 'প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সবাই বিনামূল্যে বই পাবে', প্রথম আলো, ১০ মে ২০০৯।
৭. 'একটি নতুন শিক্ষানীতির পথে', ডেইলি স্টার, ১৩ এপ্রিল ২০০৯।
৮. '২০১৩ সালের মধ্যে প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়', ডেইলি স্টার, ৩১ মার্চ ২০০৯।
৯. সমকাল, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৯।

শিশু অধিকার : শিশুদের প্রতি সব ধরনের সহিংসতা বন্ধের সুপারিশগুলো যেমন শারীরিক শাস্তি, ফৌজদারি শাস্তির সর্বনিম্ন বয়সসীমা বৃদ্ধি, বিদ্যমান বিভিন্ন আইন ও চর্চাগুলো পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় করা জাতীয় শিশুশ্রম নীতিমালা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রেও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা কর্মে নিয়োগের সর্বনিম্ন বয়স সংক্রান্ত আইএলও সনদ ১৩৮ অনুমোদন করবে, কিন্তু কবে হবে তা স্পষ্ট করেনি।[১০] ২০০৩-২০০৫ সালের জন্য কার্যকর শিশুদের যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত পূর্ববর্তী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

সংখ্যালঘুদের অধিকার : যদিও সংখ্যালঘুদের উচ্চ পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, এমনকি একজনকে মন্ত্রীও করা হয়েছে, কিন্তু সংখ্যালঘুদের সার্বিক পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় হাইকোর্ট অর্পিত সম্পত্তি আইনকে বাতিল বলে ঘোষণা করে এধরনের সম্পত্তি ফেরত প্রদানের লক্ষ্যে তালিকা তৈরির নির্দেশনা দিলেও এখনও 'অর্পিত সম্পত্তি' হিসেবে তালিকাভুক্ত করে সংখ্যালঘুদের বাস্তচ্যুত করার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। এখনও লিঙ্গ বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ধর্মীয় সংখ্যালঘু নারীদের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক।

আদিবাসীদের অধিকার : সরকার অবশেষে সাত বছর পর শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে একজন সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের জাতীয় কমিটি পুনর্গঠন করেছে। এতে বলা হয়েছে যে, ভূমি কমিশন পুনর্গঠিত হবে এবং প্রাসঙ্গিক আইন সংশোধিত হবে। কিন্তু সরকার ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে সচল করা অথবা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা থেকে বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের স্বেচ্ছায় অন্য জায়গায় বসতি স্থাপনের জন্য কোনো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এছাড়াও অস্থায়ী সেনাক্যাম্প সরানোর কাজ ত্বরান্বিত করা, পার্বত্য জেলা কাউন্সিলের কাছে সব অনুমোদিত কাজ হস্তান্তর করে সরকারি প্রশাসনকে শক্তিশালী করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে কার্যকর করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘন কমানো বা তদন্তের ক্ষেত্রেও সরকার কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি।

কর্মজীবীদের অধিকার : শ্রম আইন ২০০৬ পর্যালোচনা করার জন্য ত্রিপক্ষীয় কমিশন গঠনের উদ্যোগকে ফোরাম স্বাগত জানায়। ট্রেড ইউনিয়নের ক্রমাগত দাবির মুখেও সরকার জাতীয় সর্বনিম্ন মজুরি ঘোষণার উদ্যোগ নেয়নি। প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি করার ঘোষণা দেয়ার ফলে কর্মসংস্থান এবং শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা হুমকির মুখে। জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যনীতির ব্যাপারে এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

বিপন্ন জনগোষ্ঠীগুলো

অভিবাসী শ্রমিক : গত পাঁচ মাসে ৯০৪ জন বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকের মৃত্যু উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১১] সরকার শ্রমিক অভিবাসনের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য কূটনৈতিকভাবে

১০.শ্রম, কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক কল্যাণ মন্ত্রী কর্তৃক ৩ মে ২০০৯-এর ঘোষণা।

১১. 'পাঁচ মাসে নয়শ চার শ্রমিকের মৃতদেহ এসেছে: ৪৪% হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে', ডেইলি স্টার, ১৩ মে ২০০৯।

আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে। কিন্তু অভিবাসী শ্রমিকদের কার্যকরী আইনি নিরাপত্তা অথবা বিদেশ যাওয়ার আগে বা পরে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সরবরাহের ব্যাপারে খুবই কম ব্যবস্থা নিয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের অধিকার : সরকার এ ব্যাপারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন– বাংলাদেশ টেলিভিশনে সাঙ্কেতিক ভাষা চালু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের এবং বর্তমানে কার্যকর প্রতিবন্ধী অধিকার আইন পর্যালোচনা করার উদ্যোগ– সবই এর উদাহরণ। কিন্তু প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তা প্রত্যাহারের সাম্প্রতিক খবর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দলিতদের অধিকার : সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জাতিভেদ এখনও বিদ্যমান। দলিত সম্প্রদায় যারা কিনা দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে বাস করে এবং যাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মান খুবই খারাপ, নিম্নমানের আবাসন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের প্রচণ্ড অভাব– তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকার কোনো আইন প্রণয়ন অথবা বিশেষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

শরণার্থীদের অধিকার : শরণার্থী বিষয়ক কনভেনশন অনুসমর্থনের জন্য সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি এবং জন্মনিবন্ধন আইন ২০০৪ এক্ষেত্রে কার্যকর না থাকায় শরণার্থীদের জাতীয় আইনে দৃশ্যত কোনো স্বীকৃতি নেই। সরকার এখনও শরণার্থীদের সন্তানদের জন্মনিবন্ধন করতে রাজি নয়। ইউএনএইচসিআর পরিচালিত শরণার্থী শিবিরের বাইরে এখনও আনুমানিক ১ লাখ থেকে ২ লাখ শরণার্থী কোনো ধরনের নিবন্ধন ছাড়াই মানবেতর জীবনযাপন করছে।

সুপারিশ : ইউপিআর ফোরাম বাংলাদেশ সরকারকে সময়সীমা উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, 'নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য অঙ্গীকার' প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছে। এর মধ্যে থাকবে বর্তমান এবং অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা, যুদ্ধাপরাধ, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, অবৈধ আটক ও বন্দিত্ব এবং সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর নির্যাতনের বিষয়। এসবের সাথে জড়িতদের বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত আদালতে করতে হবে; নির্যাতিতদের এবং তাদের পরিবারদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সরকারকে নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য ঝুলে থাকা বেসরকারি সদস্য বিল বিবেচনার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে। বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ, বিশেষ করে যেসব আইনের কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যেমন অর্পিত সম্পত্তি আইন, লিঙ্গীয় পক্ষপাতমূলক ব্যক্তিগত আইনের সংশোধন, শ্রমিক অধিকার ক্ষুণ্নকারী আইনের সংশোধন, কিশোর অপরাধ আদালত এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকারকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে আসার জন্য সুস্পষ্ট রোডম্যাপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গৃহসহিংসতা আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সাম্প্রতিক সময়ে আদালত ঘোষিত যৌন হয়রানি বিরোধী নীতিমালা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে সরকারের প্রতি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাতে হবে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলকে।

হিউম্যান রাইটস্ ফোরাম অন ইউপিআর, বাংলাদেশ
(১৭টি মানবাধিকার সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত কোয়ালিশন)

ফোরামের সদস্য সংগঠন

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)- সচিবালয়, এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন (এএসএফ), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (বিএমপি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ দলিত অ্যান্ড এক্সক্লুডেড রাইটস মুভমেন্ট (বিডিইআরএম), সেন্টার ফর রিহাবিলিটেশন অব টর্চার সারভাইভারস (সিআরটিএস), ডি.নেট, কর্মজীবী নারী, নাগরিক উদ্যোগ, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, নিজেরা করি, নারী পক্ষ, ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশনস উইথ ডিজাবল (এনএফওডব্লিউডি), রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কালেকটিভ (আরডিসি), স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট (স্টেপস্), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ফোরাম সচিবালয়
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
৭/১৭ ব্লক বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭। ফোন: ৮৮-০২-৮১২৬১৩৭, ৮১২৬১৩৪
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১২৬০৪৫ ইমেইল: ask@citechco.net
ওয়েব: www.askbd.org

ইউপিআর ফোরামের পক্ষে এর সচিবালয় আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) কর্তৃক
সুইস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন- SDC এর আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত